ভক্ত-জীবনী।

"সাধক-জীবনী" "সশিষ্য-শ্রীচৈতন্য" "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত"

"রামকৃষ্ণ" "পরলোক-রহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

ও

দৈনিক বসুমতীর সহকারী সম্পাদক।

পণ্ডিত—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত।

কার্ত্তিকচন্দ্র ধর ব্রাদারের

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী।

১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩৩২—কার্ত্তিক।

মূল্য ১৲ একটাকা।

প্রকাশক :—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
ও
শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর।
"সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী"
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গাঙ্গুলী-প্রেস"
প্রিণ্টার—শ্রীশ্যামাপদ গাঙ্গুলী।
২৭, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীমদ্ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিত।

ভক্তিমার্গের সাধক বৈষ্ণব ভক্তদিগের জীবনীগুলিকে আদর্শ করিয়া থাকেন। পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী লিখিত ভক্তমাল নামক গ্রন্থে ঐ সকল জীবনী পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানি না পড়িলে বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব ও ভক্তি-মাহাত্ম্য সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এ যাবৎ এই ভক্তমালের কোন গদ্যানুবাদ ছিল না; ইহা প্রাচীনকালের প্রাকৃত-সংস্কৃত-বাঙ্গালা মিশ্রিত এক দুর্ব্বোধ্য ভাষায় পদ্যে লিখিত হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত বর্ত্তমান যুগের পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত না। সুখের বিষয় আমাদের পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ শ্যামলাল গোস্বামী সেই ভক্তমালের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি গদ্যে পরিণত করিয়া ভক্ত সমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এই নাটক-নভেল-প্রহসন উদ্ভাসিত যুগে এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রসারতা যে বিশেষ প্রয়োজন এ কথা বলাই বাহুল্য। এরূপ গ্রন্থের যতই সমাদর হয়—দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

ভগবৎ প্রেম লাভ করিবার জন্য ভক্ত-জীবনী পাঠ করা অত্যন্ত আবশ্যক, কেন-না ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।" সুতরাং এরূপ গ্রন্থ যে ভক্ত সমাজে সমাদৃত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি আশা করি, গ্রন্থকার আরও প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণাদির নবীন সংস্করণ পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিয়া সৎসাহিত্য প্রচারের দ্বারা দেশের কল্যাণ বিধান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি।
৪০ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

স্বামী অভেদানন্দ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভক্ত-জীবনী।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হোসেন সাহ বাঙ্গালার নবাব হইলে তাঁহার নিকট হইতে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই ভ্রাতা সপ্ত-গ্রাম পত্তনী লইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তৎকালে কুড়ি লক্ষ টাকা আদায় হইত। তন্মধ্যে নবাবকে বার লক্ষ টাকা দিয়া অবশিষ্ট আট লক্ষ টাকা দুই ভ্রাতায় লাভ করিতেন। তৎকালের আট লক্ষ টাকা বর্ত্তমানে কোটী টাকার তুল্য, সুতরাং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ঔরসে ১৪১৭-১৮ শকে রঘুনাথের জন্ম হয়। রঘুনাথ বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় মন দিবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। হরিদাস বাবাজীর নাম-সংকীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মভাবের বীজ অঙ্কুরিত হয়। কালে প্রেমাবতার ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মনোপ্রাণহারী কীর্ত্তনে যে কয়েকটী ভক্তের প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে রঘুনাথদাস গোস্বামী অন্যতম। রঘুনাথের পিতা অতীব ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন, অতি রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিয়া-

ছিলেন, অযুত দাসদাসী রঘুনাথের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাধুরী, প্রেমসুধা যাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার কি আর এ সব বাহ্য বিষয় সম্ভোগ ভাল লাগে? রঘুনাথের নিকট পিতৃপ্রদত্ত সুমহান্ রাজপ্রাসাদ কারাগারের মত ভীষণ বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল—যুবতী পত্নীর বিম্বাধরের অমৃতরাশি তাঁহার নিকট গরল বলিয়া অনুমিত হইল। রঘুনাথ "শ্রীগৌরাঙ্গ" "শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে কোনমতে গৃহ-বেষ্টনীর মধ্যে রাখিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিলেন। কিন্তু মূর্খ মানব বুঝিল না—রজ্জুদ্বারা মানুষের স্থূল হস্তপদাদি বন্ধন করা যাইতে পারে, কিন্তু মন ত মানুষের চির স্বাধীন। যার মন মধুকর ভগবচ্চরণ-কুসুম-পরিমল আহরণে প্রধাবিত হইয়াছে, মূর্খ মানবের সাধ্য কি তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? রঘুনাথকে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়াও আত্মীয় স্বজনেরা যখন দেখিলেন যে, রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের নামে আত্মহারা, তাঁহার মন শ্রীচৈতন্যেই বিলীন হইয়াছে, তখন তাঁহারা রঘুনাথকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। বহুদিনের রুদ্ধ স্রোত যেমন একবার পথ পাইলে দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া দ্বিগুণ-বেগে সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়, তেমনি রঘুনাথ বন্ধনমুক্ত হইয়া একেবারে "শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিতে বলিতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলেন। তখন ভগবান শ্রীচৈতন্য শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থান করিতে-ছিলেন। রঘুনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে উন্মাদের মত পুরুষোত্তমধামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কত নদ নদী সন্তরণে উত্তীর্ণ হইলেন, কত কুশাঙ্কুর তাঁহার পদতলে দলিত মথিত হইল, কত বিনিদ্র রজনী, অভুক্ত দিবা অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একমনে

চলিতে চলিতে শেষে পুরুষোত্তমধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভগবান শ্রীচৈতন্যের চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা, চক্ষে প্রেমের মুক্তাধারার ন্যায় অশ্রুধারা দেখিয়া একেবারে অভিভূত হইলেন। তিনি রঘুনাথকে কোল দিলেন। রঘুনাথ আপন আকাঙ্ক্ষিত ধন পাইয়া জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন! রঘুনাথ কি আহার করিতে লাগিলেন, তাহা ভক্তমাল চরিতাখ্যায়কের কথাতেই বলি :—

> শড়া মহা প্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে তারয়ে।
> ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে॥
> তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষা কাজে।
> বিষয় সুখের লেশমাত্র নাহি সুজে॥"

কতক দিন পুরুষোত্তমধামে অবস্থান করিয়া রঘুনাথ বৃন্দাবনধামে গেলেন। সেখানে রাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতে লাগিলেন। এই রাধা-কুণ্ডের তীরে "রাধা কৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে রঘুনাথ দাসের দিনাতি-পাতিত হইতে লাগিল। কতকাল হইল রঘুনাথের স্থূলদেহ রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকায় সমাহিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও বৃন্দাবনের প্রতি বনস্পতি তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছে।

শ্রীরূপ-সনাতন।

রূপ-সনাতনের পিতার নাম কুমার দেব ও মাতার নাম রেবতী। বাল্যে রূপের নাম ছিল সন্তোষ। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রূপ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব হয়।

সনাতনের পিতৃদত্ত নাম অমর। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে সনাতন জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। পূর্ব্বে হুসেন সাহের মন্ত্রিত্বকালে সনাতন অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন এবং নিজের বসত-বাটী প্রসারিত করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণের বাটী দখল করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিতে সঙ্কল্প করেন। তাহাতে রূপ তাঁহাকে "য-রী, র-লা, ই-রং, ন-য়া, এই আটটি অক্ষর লিখিয়া ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন। সনাতন অষ্টাক্ষর দ্বারা এই শ্লোকটী পূরণ করিয়া লইলেন—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

শ্লোকের মর্ম্মার্থ বোধ হইলে সনাতনের চৈতন্যোদয় হইল, অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণকে স্ববাসে থাকিতে দিলেন এবং নিজে সংসার বিষয়ে উদাসীন হইলেন।

মহাত্মা প্রভুর পরম ভক্ত শ্রীরূপ সনাতন দুই সহোদর শ্রীগৌরাঙ্গের এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনধাম হইতে কেহ নবদ্বীপে

আসিলে প্রভু তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমার পরম ভক্ত রূপ-সনাতন কেমন আছে সর্ব্বাগ্রে আমাকে তাহাই বল।"

এমন ধারা রূপ-সনাতন গৌড়ের নবাবের অমাত্য ছিলেন। বাদশাহ ইঁহাদিগকে দবীরখাস ও সাকর মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন। অর্থ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যে ইঁহারা দুই ভাই অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু এত ধন-বিভবের আকর্ষণেও তাঁহাদের প্রাণ বাঁধা পড়ে নাই। প্রভু যখন বৃন্দাবনধামে যাইবার সময় কানাইয়ের "নাটশালা" নামক গ্রামস্থ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রূপ-সনাতন যাইয়া প্রভুর চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন। প্রভু তাঁহাদের অকপট ভক্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকে কোল দিলেন এবং দুই ভায়ের মধ্যে শ্রীরূপ প্রথমে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামে নিবিষ্ট হইলেন। এদিকে শ্রীল সনাতন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার আদৌ মন লাগিল না। তিনি বিরলে বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিতে লাগিলেন। "পাৎসাহ" সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—সনাতন সংবাদ পাঠাইলেন তাঁহার অসুখ করিয়াছে। পীড়ার সংবাদ শুনিয়া বাদসাহ তৎক্ষণাৎ বৈদ্য পাঠাইলেন। কিন্তু সনাতন বৈদ্যকে ফেরত পাঠাইলেন। বৈদ্যের মুখে সনাতনের সুস্থ-তার সংবাদ পাইয়া বাদসাহ নিজে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন! বাদসাহ কহিলেন, "তুমি দরবারে যাও না কেন, তোমার কি হইয়াছে, কারণ কি? তোমার এক ভাই ত ফকীর হইয়া গিয়াছে, তুমিও কি তাহাই করিবার মতলব করিতেছ? বাদসাহের কথা শুনিয়া সনাতন বলিলেন, আমার আর রাজকার্য্যে মন নাই, আমাকে এখন বিদায় দিন,—আমি ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলন করিয়া দিন কাটাইব স্থির করিয়াছি। বাদসাহ ইঁহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া সনাতনকে কারাগারে

আবদ্ধ করিলেন। সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াই বাদসাহ দক্ষিণ ভারতে অন্য একজন নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। একদিন সনাতন কারাগারের প্রহরীকে বলিলেন, দেখ যদি তুমি আমাকে অন্যের অজ্ঞাতসারে মুক্ত করিয়া দাও, তবে আমার লোক তোমায় পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিবে।" ইহা শুনিয়া যবন কারারক্ষক বলিল, "ঠাকুর এতদিন আপনার আদেশে উঠিয়াছি বসিয়াছি, আপনি এতদিন আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু এরূপ অসম্ভব আদেশ করিবেন না,— যদি বাদসাহ কোন ক্রমে জানিতে পারেন তবে আমার জীবন সঙ্কট হইবে।" শ্রীসনাতন বলিলেন, দেখ আমাকে মুক্তি দিলে আর আমি এ দেশে আসিব না, "দরবেশ" সাজিয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইয়া বেড়াইব, বাদসাহ আমার উদ্দেশ পাইবেন না। কিন্তু জেল-রক্ষক কোন মতে তাহাতে রাজী হইল না। তখন সনাতন তাহাকে সাত হাজার টাকা দিতে রাজী হওয়ায় সে এক নিশীথ রাত্রে সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়া দিল। সনাতনের বিশ্বস্ত অনুচর ঈশান সনাতনকে সঙ্গে লইয়া বন্য পথ ধরিয়া ক্রমে পাতড়া পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইল। ঈশানের নিকট পঞ্চদশটি মোহর ছিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া "ভূঞা" নামে এক দস্যু অতি সমাদরে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া আতিথ্য সৎকার করিতে ইচ্ছা করিল। দস্যুর অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া সনাতনের মনে ঘোরতর সন্দেহ হইল। তিনি ঈশানকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, ঈশান, তোমার কাছে কি কিছু আছে? ঈশান বলিল, পনরটি মোহর আছে। তাহা শুনিয়া সনাতন বলিলেন, এই পনরটি মোহর এখনই আমায় দেও, নতুবা এই দস্যুর হস্তে আমাদের জীবননাশ হইবে। ঈশান সনাতনের হস্তে সেই পনরটি মোহর প্রদান করিলেন। সনাতন একটি ঈশানের হস্তে দিয়া বাকী চৌদ্দটী দস্যুর হস্তে প্রদান করিলেন। দস্যু বলিল,

তুমি অতি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ করিয়াছ,—এই মোহর যদি তুমি আমায় অর্পণ না করিতে, তবে তোমাদিগকে আমরা রাত্রিকালে হত্যা করিতাম।” এই বলিয়া দস্যু সনাতনের হস্তে সেই মোহর চৌদ্দটি অর্পণ করিয়া বলিল, তোমরা যখন স্বেচ্ছায় এই মোহর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, তখন তোমাদের জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই। সনাতন সেই মোহর ঈশানের হস্তে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, ঈশান, তুমি গৃহে চলিয়া যাও, আর এ ভাবে কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে থাকিও না। ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে চলিয়া গেল। সনাতন একাকী পথ চলিয়া হাজীপুর নামক গ্রামে যাইয়া এক বাগিচাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর মুহুর্মুহু তাঁহার মুখ হইতে “কৃষ্ণ”, “কৃষ্ণ” ধ্বনি নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই বাগিচার ভিতর ঘটনাক্রমে তাঁহার ভগ্নীপতি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি অশ্ব ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” ধ্বনি শুনিয়া নিকটে যাইয়া দেখেন, শব্দকারী আর কেহই নহেন—রাজমন্ত্রী শ্রীল সনাতন। তিনি তৎক্ষণাৎ সনাতনের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কি কারণে তুমি সহসা এরূপ বৈরাগ্য-পরায়ণ হইলে? গৃহে যাও, সেখানে যাইয়া কৃষ্ণ নাম ভজনা কর। সনাতনের সঙ্গে কোন প্রকার শীতবস্ত্র ছিল না—তখন প্রচণ্ড শীত। সনাতনকে শূন্যগাত্রে দেখিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি তাঁহাকে একখানি শাল দিলেন, সনাতন তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি একখানি বনাত আনিয়া সনাতনের অঙ্গে দিলেন, সনাতন তাহাও দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তাহার পর একখানি কম্বল দিলেন, এবার অনেক উপরোধে সনাতন তাহা গায়ে দিয়া বারাণসী ধামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কাশীতে তখন চন্দ্রশেখরের ঘরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অবস্থান করিতেছিলেন। সনাতন কোন্ সাহসে গৃহের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন? তাই তিনি গৃহের বাহিরে বসিয়া রহি-লেন। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, আজ একজন সাধু ভক্ত বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি গৃহের বাহিরে খুঁজিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার ভক্তগণ পাঁতি পাঁতি করিয়া গৃহের বহির্ভাগ অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া কোন বৈষ্ণবের উদ্দেশ না পাইয়া মহাপ্রভুকে আসিয়া বলিল, "প্রভু, বাহিরে কোন বৈষ্ণবকে দেখিলাম না, তবে একজন কাঙ্গাল বসিয়া আছে।"

মহাপ্রভু বলিলেন, সেই কাঙ্গালকেই আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তাহাকেই চাই। তখন সনাতনকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল।

"দুই গোছা তৃণ করে, এক গোছা দন্তে ধরে,
পড়িলা গৌরাঙ্গ রাঙ্গা পায়।
দু'নয়নে শত ধারা, রাজ দণ্ডি জনপারা,
অপরাধী আপনা মানয়॥
তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয় ভোগ, কামাদি ষড়াঙ্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি॥"

* * * * *

এই ভাবে সনাতন মহাপ্রভুর বন্দনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন, "সনাতন তুমি বৃন্দাবনে গিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার কর। তাহা হইলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি প্রফুল্ল হইবেন।" সনাতন প্রভুর আজ্ঞানুসারে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া গ্রন্থানুশীলন

করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া একখানি বহুমূল্য "স্পর্শমণি" পাইলেন। এই স্পর্শমণি সংযোগে অতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোহাও সোণা হয়। তিনি মনে করিলেন, কোন দীন দরিদ্রকে দেখিলে তাহাকে এই স্পর্শমণি দিবেন, এখন কোথাও লুকাইয়া রাখি। তিনি এই ভাবিয়া সেই স্পর্শমণি স্পর্শ না করিয়া একখানি খাপ্‌রাতে করিয়া লইয়া মৃত্তিকায় তাহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন।

এদিকে বর্দ্ধমান জেলার মানকর নিবাসী জীবন নামে বহু পরিবার-ক্লিষ্ট একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোনরূপে পরিবার ও আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বিধান করিতে না পারিয়া কাশীধামে আসিয়া কঠোর শিবারাধনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার কঠোর তপশ্চর্য্যা দেখিয়া মহাদেব তাহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করিলেন, "দেখ্, বৃন্দাবন-ধামে সনাতন নামে এক সাধু আছে, তুই তাহার নিকট যা, তোর অভাবের প্রতীকার হইবে।" জীবন তদনুসারে বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া মনোভাব ব্যক্ত করিল; সনাতন ত শুনিয়াই অবাক্! বাবা মহেশ্বর কি তবে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সহিত ছলনা করিলেন! সনাতন দরিদ্র—নিঃস্ব বৈষ্ণব—গাছের তলায়, পথের ধূলায় তাহার বাস—তিনি কোথায় জীবনকে দিবার জন্য টাকা পাইবেন? সনাতন ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ মনে পড়িল—তাঁহার সেই স্পর্শমণির কথা। হাঁ, বাবা মহেশ্বর মিথ্যা কথা বলেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনকে সঙ্গে লইয়া যমুনার তীরে যাইয়া বামহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন যে ঐখানের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখ, এক-খানি বহুমূল্য প্রস্তর পাইবে। ব্রাহ্মণ খুঁড়িতে খুঁড়িতে স্পর্শমণিখানি

পাইল এবং সনাতনকে প্রণাম করিয়া উল্লসিত মনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে জীবনের মনে এই চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। স্পর্শমণি—এ ত নিতান্ত সামান্য তুচ্ছ বস্তু নহে, সনাতন নিজে না ভোগ করিয়া এ বস্তু আমাকে দিল কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সনাতনের নিকট এতদপেক্ষা আরও মূল্যবান বস্তু আছে। সে বস্তু কি? তিনি যে মহার্ঘ রত্ন পাইয়াছেন—সেই মহার্ঘ রত্ন আমি তাঁহার নিকট হইতে এবার কাড়িয়া লইব। এই সব ভাবিতে ভাবিতে জীবন বটেশ্বর নামক গ্রাম হইতে বৃন্দাবন ধামাভিমুখে ফিরিয়া গেলেন এবং সনাতনের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, আপনি যে অমূল্য রত্নের অধিকারী আমাকে সেই অমূল্য রত্ন দিন। সনাতন বলিল, "আমি যে অমূল্য রত্নের অধিকারী সেই রত্ন আর কিছুই নহে, "কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব"। এই ধনের অধিকারী হওয়া বড় কঠিন কাজ। তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, দেশে যাইয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিও, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।" কিন্তু জীবন কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না, সে স্পর্শমণিকে টান মারিয়া যমুনার জলে ছুড়িয়া ফেলিল এবং বলিল, "ঠাকুর, আমাকে দীক্ষা দিতেই হইবে।" সনাতন জীবনের ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বে দীক্ষা দিলেন। সেই জীবনের বংশধরগণ আজিও কাটামার গাঁয়ে বসতি করিতেছেন। আর সেই মানকর বর্ত্তমানে "মাড়া-গাঁ" নামে প্রসিদ্ধ।

সনাতনের ন্যায় শ্রীরূপ গোস্বামীও জীবনের অবশিষ্ট কাল বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তিনিও মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা নিজের দেহমধ্যস্থ আত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের ভোগরাগ দিতেন। বৈষ্ণব-জগতে—ভক্ত-মহলে এই দুই ভায়ের স্থান অতি উচ্চে।

শ্রীগোপাল ভট্ট।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তীর্থ-ভ্রমণে যাইবার কালে চাতুর্ম্মাস্য করিবার জন্য ভট্টমারি নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই গ্রামের বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ প্রভুর যথোচিত আদর, যত্ন ও সেবাশুশ্রূষা করিতেছিলেন। বেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট প্রাণমন দিয়া প্রভুর সেবা করিতে থাকেন। প্রভু গোপালের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। গোপাল সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া রাধারমণের উপাসনায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিলেন। সেখানে একটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া গোপাল ভট্ট তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক পূজার্চ্চনা দেখিয়া নানা স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া সেই বিগ্রহকে পুষ্প-চন্দন-বস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রদান করিতে লাগিল। গোপাল ভট্ট তাহা ঠাকুরের অঙ্গে পরাইবার সময় ভাবিলেন,—ঠাকুর যদি আমার ঠাকুর হইতেন, তবে নিজেই এই সমস্ত বসনভূষণ পরিধান করিতেন। পরদিন গোপাল ভট্ট বিগ্রহকে প্রণাম করিতে যাইয়াই দেখেন সে শালগ্রাম শিলা আর নাই, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমারূপ ভুবনমোহন, সুচিক্কণ অঙ্গরাগ, দিব্যকান্তি মুরলী-বদন শ্যামচাঁদ দাঁড়াইয়া। দরিদ্র যেমন মহানিধি পাইলে আনন্দে আত্মহারা হয়, সেইরূপ গোপালভট্ট চতুর্ভুজ শ্যামরূপ দেখিয়া একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি ঠাকুরের নাম "রাধারমণ" রাখিলেন। গোপাল ভট্ট আজীবন এই রাধারমণের সেবা করিয়া কাটাইয়া ছিলেন। আজিও তাঁহার বংশধরগণ বৃন্দাবন ধামে এই রাধারমণের পূজার্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন।

অজামিল।

অতি প্রাচীনকালে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ তনয় ছিলেন। জগতে এমন কোন দুষ্কর্ম্ম ছিল না, যাহা অজামিলের অকরণীয় ছিল। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, মাংসাহার এ সকল অজামিলের নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঘরে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী সতী সাধ্বী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ছিল, অজামিল সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বারবণিতা লইয়া বাস করিত। সেই বারাঙ্গনার গর্ভে অজামিলের চারিটী পুত্রসন্তান হইয়াছিল। অজামিল সেই বারবণিতা পুত্র লইয়াই অহোরাত্র আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করিত, ভুলিয়াও সংসারের নাম করিত না। একদিন ভগবান তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য এক সাধুর বেশে সেই বারাঙ্গনার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বারাঙ্গনা যথাযোগ্য সমাদরে অতিথির সৎকার করিল। সাধু বিদায়-কালে বলিলেন, দেখ তোমার আতিথ্য-সৎকারে আমি পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, যদি আমাকে আরও তৃপ্ত করিতে চাও, তবে এবার তোমার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহার নাম "নারায়ণ" রাখিও। বারাঙ্গনা হাসিয়া বলিল, ইহাতে আর আমার আপত্তির কারণ কি আছে? বেশ তাহাই হইবে। ইহার কিছুদিন পরে সেই বেশ্যার গর্ভে অজামিলের ঔরসে একটি পুত্রসন্তান হইল, বেশ্যা প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই পুত্রের নাম রাখিলেন "নারায়ণ।" অজামিল দিন রাত "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া এই শিশুপুত্রকে ডাকিত। সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। অতঃপর যমদূতেরা অজামিলের মৃত দেহ যমালয়ে লইবার জন্য উপস্থিত হইল। এদিকে বিষ্ণুলোক হইতে শ্যামল—সুন্দর নামে দুইজন বৈকুণ্ঠের

দূত আসিয়া অজামিলের শবদেহ পুষ্পকরথে করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। যমদূতেরা অবাক্ হইয়া যমের কাছে যাইয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিয়া কহিল, আর ত্রিজগতে তোমার শাসন চলিল না। যমরাজ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—

"হরিগুণ কথা যথায় শুনিবে,
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে।
নমস্কার করি তথা দূর পথে যাবে।
মুঞি তাঁরে নমস্কারি কায়মন-রবে॥"

শবরী।

শবরী দণ্ডকারণ্যে মতঙ্গের আশ্রমস্থ মুনিগণের পরিচারিকা ছিল। শবরী চণ্ডালের কন্যা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে তাহার দৃঢ়মতি। আশ্রমের মধ্যে যে সব সাধু মুনিগণ তপস্যা করেন, শবরী কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের অগোচরে সেবা শুশ্রূষা করে। রাত্রিকালে যখন তপোবন নিস্তব্ধ হয়, তখন শবরী বন হইতে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মুনিঋষিদের আশ্রমে রাখিয়া দেয়। মুনিরা নদীতে স্নান করিতে যাইবেন, শবরী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পথের কণ্টক, কঙ্কর প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া রাখে। মুনিরা কিন্তু কিছুতেই স্থির করিতে পারেন না, কে তাঁহাদের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করে—আর কেই

বা পথঘাট পরিষ্কার করিয়া রাখে! একদিন রাত্রে মুনিদের শিষ্য-মণ্ডলী কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থের জন্য সারারাত্রি জাগিয়া রহিল। নিশীথ রাত্রে তাঁহারা দেখেন শবরী কাষ্ঠসমূহ আনিয়া মুনিদের আশ্রমের পার্শ্বে স্তূপীকৃত করিতেছে। তখন সকল শিষ্য মিলিয়া শবরীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। শবরী ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাঁহারা শবরীকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তখন একজন সাধু, সদাশয়, ধীরবুদ্ধি মুনি শবরীর ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন এবং তাহাকে রামনামে দীক্ষা দিলেন। ইহাতে অন্যান্য মুনিগণ সেই মুনিকে বর্জ্জন করিলেন। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া শবরীকে শিষ্যার মত দেখিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শবরীর গুরু দেহত্যাগ করিলেন। শবরী গুরুর শোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন। একদিন প্রত্যূষে নদীতে মুনিগণ স্নান করিতেছেন, দূরে শবরীও অতি সঙ্কোচের সহিত স্নান করিতেছেন। মুনিগণ তাহা দেখিয়া শবরীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, কি এত বড় স্পর্দ্ধা! চণ্ডালিনী হইয়া মুনি-ঋষিদের ঘাটে স্নান করিস্? শবরী অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তীরে উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল সমস্ত কৃমি-কীটাদি পরিপূর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপিও মুনি-ঋষিগণ শবরীর মাহাত্ম্য বুঝিলেন না। এদিকে বনের মধ্যে একখানি কুটীর বাঁধিয়া শবরী ভগবান রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল। বন হইতে ভাল ভাল ফলমূল যাহা সে আহরণ করিয়া আনিতে লাগিল, তাহা শবরী নিজে আস্বাদ করিয়া যদি দেখিত যে বড় মিষ্টি—অমনি তাহা ভগবান রামচন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিত। ক্রমে শবরীর আশা পূর্ণ হইল। একদিন সত্য সত্যই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে আসিয়াই প্রথমে "শবরী" "শবরী" বলিয়া

ডাকিতে লাগিলেন। শবরী সেই ডাক শুনিবামাত্র পাগলিনী প্রায় কুটীর হইতে বাহির হইয়া চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। তারপর যখন স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন শবরী একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। শবরীর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দুই ভাইই শবরীর প্রেমাশ্রু দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শবরী দুঃখিনী—কাঙ্গালিনী—কি দিয়া সে ভগবানের তৃপ্তি সাধন করিবে? ঐ যে ভাল ভাল মিষ্ট ফল নিজে আস্বাদ করিয়া ভগবানের জন্য অতি সযতনে রাখিয়া দিয়াছিল, শবরী কুটীরাভ্যন্তরে যাইয়া তাহাই আনিয়া রামচন্দ্রকে দিল। সেই উঠানে তৃণাসনে রামলক্ষ্মণকে বসিতে দিয়া শবরী মৃৎপাত্রে করিয়া জল দিল। ভক্ত-বৎসল ঠাকুর অতি তৃপ্তির সহিত সেই উচ্ছিষ্ট ফল ভক্ষণ ও জল পান করিলেন। অতঃপর রামচন্দ্র নদীতটে গিয়া মুনিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নদীর জল কৃমিকীটাদি পরিপূর্ণ হইল কিসে? মুনিগণ তাহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন ঠাকুর বলিলেন, শবরীকে নদীতে স্নান করিতে না দেওয়ায় এইরূপ হইয়াছে. তখন তাঁহারা শবরীকে লইয়া নদীতে অবতরণ করান মাত্র শবরীর পাদ-স্পর্শে নদীর জল স্ফটিক-স্বচ্ছ হইল। মুনিগণ কৃষ্ণ-ভক্তের মহিমা বুঝিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বুঝিলেন, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ"। কালক্রমে শবরী রামচন্দ্রের পদ ধ্যান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিল।

মহারাজ অম্বরীষ।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা একদা দ্বাদশীর প্রত্যূষে আসিয়া মহারাজ অম্বরীষের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ অম্বরীষ তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শিষ্যগণ সহ মুনিশ্রেষ্ঠ স্নান করিতে গেলে দ্বাদশীর পারণের কাল উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া মহারাজ একবিন্দু জলগ্রহণ করিলেন। এদিকে দুর্ব্বাসা আসিয়া তাহা শুনিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া মহারাজকে ধ্বংস করিবার জন্য নিজের মাথা হইতে একটি জটা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অমনি এক প্রচণ্ড অগ্নিপিণ্ড সেই জটা হইতে বাহির হইয়া মহারাজকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। এদিকে ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান সুদর্শন-চক্র প্রেরণ করিলেন। সেই সুদর্শন-চক্র নিমেষের মধ্যে সেই অগ্নিপিণ্ডকে ধ্বংস করিয়া দুর্ব্বাসাকে নাশ করিবার জন্য তাহার দিকে প্রধাবিত হইল। মুনি তখন অনন্যোপায় হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে একেবারে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই সুদর্শন-চক্র চলিতেছে। মুনি যাইয়া একেবারে ব্রহ্মার পদতলে পড়িয়া জীবন-ভিক্ষা চাহিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, বিষ্ণুভক্তের ক্রোধানল হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তুমি এখনই আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। নিজেও মরিবে—আবার আমাকেও মারিবে কেন? তখন দুর্ব্বাসা অনন্যোপায় হইয়া শিবলোকে যাইয়া শিবের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। শিবও শশব্যস্তে বলিলেন, তুমি শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও, বিষ্ণুভক্তকে যে অপমান করে তাহাকে রক্ষা

করিবার ক্ষমতা আমার নাই; তখন দুর্ব্বাসা অনন্যোপায় হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়া স্বয়ং বিষ্ণুর পাদপদ্মে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। অন্তর্য্যামী বিষ্ণু পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাই জানিতেছিলেন। তিনি মুনির ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন—

"ভক্ত মোর প্রাণ মুঞি ভক্তের অধীন।
মুঞি ভক্তহৃদে বসি আমাতে অভিন॥
এ দেহ বিক্রীত মোর ভকতের স্থানে
হেন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি কারণে?'

কিন্তু যাহাই হউক, শরণাগতকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম, তাই তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য বলিতেছি, তুমি এখনই যাইয়া মহারাজ অম্বরীষের শরণাপন্ন হও। তিনি ছাড়া তোমাকে এ ত্রিভুবনে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। তপস্বী দুর্ব্বাসা তখন লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া বায়ুবেগে মহারাজ অম্বরীষের রাজধানীর দিকে ধাবিত হইলেন।

এদিকে যেদিন হইতে সুদর্শনচক্র মহর্ষি দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, সেই দিন হইতে মহারাজ অম্বরীষও অনাহারে বসিয়া কেবল মনে মনে ভগবানকে ডাকিতেছেন, ভগবন্! আমা হ'তে ব্রাহ্মণের যেন কোন প্রকার অমঙ্গল না হয়। এরূপ সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মহর্ষি দুর্ব্বাসা অম্বরীষের কাছে যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন;— বলিলেন, মহারাজ! এতদিন মনে মনে একটা অনর্থক দাম্ভিকতা ছিল, যোগ-তপঃ করি বলিয়া বুঝি আমরা মহা সাধু, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি—আপনাদের হৃদয়ে যে ভক্তি আছে তাহার কণামাত্রও আমাদের নাই। মহর্ষির কাকুতি-মিনতি দেখিয়া মহারাজ অম্বরীষ সুদর্শন-চক্রকে নানাপ্রকারে স্তব-স্তুতি করিয়া নিরস্ত হইতে বলিলেন।

সুদর্শন-চক্র তপস্বীকে ক্ষমা করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। এদিকে দুর্ব্বাসাও শোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ অম্বরীষ এতাদৃশ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহার ভক্তির কথা শুনিয়া এক রাজকন্যা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মাদিনীপ্রায়া হইয়াছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ সেই রাজ-দুহিতার প্রস্তাব কোনমতে অন্যথা করিতে না পারিয়া অবশেষে একখানি খড়্গ পাঠাইয়া দিলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে সেই খড়্গের সহিত রাজ-কুমারীর বিবাহ হইল। বিবাহান্তে রাজ-কুমারী পতিগৃহে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহাদির সেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি যতকাল জীবিতা ছিলেন, স্বামীর পূজার্চ্চনায় সহায়তা করিতেন এবং নিজে প্রেমানন্দে নাচিয়া নাচিয়া শ্যামচাঁদের বিগ্রহের নিকট গান করিতেন। মহারাজ অম্বরীষ অন্যান্য রাণীদের অপেক্ষা এই নব-পরিণীতা রাণীর কৃষ্ণভক্তিতে মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়াছিলেন।

বিদুর।

বিচীত্রবীর্য্য রাজার এক দাসী-পত্নীর ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে বিদুরের জন্ম। কথিত আছে যে, অণি-মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্ম্মরাজকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি দেবরাজ তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে। বিদুর বিলাস-ব্যসনাদি বিবর্জ্জিত ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন এবং

ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপরামর্শ দান ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাপারেই ইনি লিপ্ত থাকিতেন না। ইঁহার সহায়তায় পাণ্ডু-পুত্রেরা জতুগৃহ হইতে রক্ষা পান। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণের সতত অনিষ্ট চিন্তা করিতেন বলিয়া ইনি সর্ব্বদাই দুঃখিতভাবে কাল হরণ করিতেন। কপটদ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরাদি বনবাসে গেলে ইনি তাঁহাদের জননী কুন্তীকে নিজের আলয়ে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন। ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাকে রাজ-ভবন হইতে বিতাড়িত করেন।

বিদুর ভক্তকুলের শিরোমণি। যেমন বিদুর, তেমনি তাঁর সহধর্ম্মিণী। বিদুরের স্ত্রী স্নান করিতে উলঙ্গাবস্থায় পুকুরে নামিয়াছেন, এমন সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া "বিদুর" "বিদুর" বলিয়া ডাকিতেছেন। আর কি রক্ষা আছে! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন! বিদুরের স্ত্রী অমনি জল হইতে উঠিয়া সেই নগ্নাবস্থাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। ভগবান বিদুর-স্ত্রীর সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থা দেখিয়া আপন উত্তরীয় বস্ত্র তাঁহার গায়ে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু কে কার উত্তরীয় বস্ত্র পরে? বিদুরের স্ত্রীর আজ কি আর বাহ্যজ্ঞান আছে? তাঁর কত আকাঙ্ক্ষার ধনকে তিনি আজ পাইয়াছেন, আর কি আজ তাঁর সংজ্ঞা আছে? তিনি ঘরে ঢুকিয়াই ভগবানের পাদধৌত করিতে যাইবেন, কিন্তু এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য যে পায়েই মালা পরাইতে লাগিলেন। তারপর খাবার! কই দরিদ্র বিদুরের ঘরে ত আজ কোন খাবার নাই! কয়েকটা কলা ছিল, বিদুরের স্ত্রী তাহাই আনিয়া ভগবানকে খাওয়াইতে লাগিলেন। কখন বা ছোবড়া ছাড়াইয়া কলা ভগবানের হাতে

দিতেছেন, আবার কখন বা ভাবে বিহ্বল হইয়া শুধু ছোবড়া ভগবানের হাতে দেওয়া হইতেছে! আর ভক্তবৎসল ভগবান পরম তৃপ্তির সহিত সেই ছোব্ড়াই খাইতেছেন। এমন সময় রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা হইতে ভগবানের আগমন সংবাদ শুনিয়া বিদুর গৃহে আসিয়া দেখেন যে ভগবান কলার ছোব্ড়া হাতে করিয়া তাহাই খাইতেছেন! তাহা দেখিয়া বিদুর স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, এ কি ব্যাপার! ভগবানকে কলার ছোব্ড়া খাইতে দিতেছ? এতক্ষণে বিদুরের স্ত্রীর সংজ্ঞা হইল, তিনি ভগবানের হাত হইতে ছোব্ড়া কাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। হায়! হায়! আজ আমি কি করিলাম, যাঁহাকে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কত তপস্যা করিয়া পায় না, তাঁহাকে কিনা আজ কলার ছোব্ড়া খাওয়াইলাম! ভগবান কিন্তু বিদুর-পত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আমি তোমার এই ছোব্ড়ায় যত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, এরূপ তৃপ্তি রাজার প্রাসাদে পলান্নেও পাই না।" এমনই ধারা অকপট কৃষ্ণপ্রেম ছিল—বিদুর ও তাঁহার পত্নীর।

শ্রীসুদামা বিপ্র।

ইনি শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী। ইনি কৃষ্ণ-বলরামের সহিত সন্দীপাণি মুনির নিকট একত্রে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সুদামা বিপ্র বড় দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের বনে বনে ধেনু চরাইতেন,

তখন সুদামা তাঁর সখা ছিলেন। এখন সেই ব্রজের গোপাল আর পাচনীধারী রাখাল বালক নন, এখন তিনি দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। একদিন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, দেখ, সংসারে অন্নবস্ত্রের এ কষ্ট ত আর সহ্য হয় না, একবার দ্বারকায় গিয়া তোমার সেই বাল্য-সখাকে নিজের অবস্থাটা বলিয়া কিছু সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আন না কেন?

সুদামা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই করা যাউক, কিন্তু রাজারাজড়ার সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলে কিছু "ভেট" দিতে হয় ত! বল ত কি ভেট দেওয়া যাইবে?" তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "আমরা গরীব লোক —আমাদের কি সম্বল আছে, এই "ক্ষুদ"ক'টী (তণ্ডুলের কণা) আছে, ইহাই লইয়া যাও।" সুদামা বিপ্র পুঁটুলী বাঁধিয়া সেই ক্ষুদ লইয়া দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, অত্যুচ্চ বিশাল রাজপ্রাসাদ। তোরণ-দ্বারে বিশালকায় মাতঙ্গ, নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত প্রাসাদের শ্রেণী সারিবদ্ধভাবে রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অতুল বৈভবের পরিচয় দিতেছে! দেখিয়া সুদামা বিপ্রের চক্ষু স্থির হইল। সুদামা মনে মনে ভাবিলেন, তাই ত এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী রাজা যে, তাঁহার নিকট এই "ক্ষুদ" উপস্থিত করিব কেমন করিয়া! সুদামা বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে সেই ক্ষুদের পুঁটুলীটি লুকাইলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বারকার রাজপুরী সর্ব্বদাই মুক্ত। সুদামা যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সকাশে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া "এস এস সখা" বলিয়া সুদামাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে শ্রীমতীও বসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সুদামা দুই বন্ধুতে তখন পরস্পর গলা ধরিয়া বাল্য ও কৈশোরের কত কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে অন্তর্য্যামী ভগবান বলিলেন, সখা তোমার বগলে ওই কিসের পুঁটুলী! সুদামা লজ্জিত লইয়া বলিলেন, কিছু না সখা, কিছু না!

তখন অন্তর্য্যামী ভগবান বলিলেন, কিছু না বলিলে কি ছাড়ি, নিশ্চয়ই কিছু আছে, এই বলিয়া তিনি পুঁটুলী লইয়া নিজে একমুষ্টি ক্ষুদ খাইলেন আর লক্ষ্মীদেবীকে একমুষ্টি দিলেন। সুদামা "কি কর, কি কর" এ কি রাজার খেতে আছে? বলিয়া কৃষ্ণের হাত ধরিয়া মাথায় রাখিয়া বলিলেন, "সখা আমার দিব্য যদি আর এই তণ্ডুল-কণা খাও।"

কয়েকদিন দ্বারকায় থাকিয়া সুদামা স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে আসিয়া ভাবিলেন, কই সখাকে ত আমার দুরবস্থার কথা কিছুই বলা হইল না! ঘরে যে একমুষ্টি তণ্ডুল নাই! কি লইয়া—কোন্ মুখে ঘরে ফিরিয়া যাইব? আবার ভাবিলেন, সখার কাছে ধন চাই নাই ভালই করিয়াছি, ধনে কেবল রজোগুণের বৃদ্ধি হয়—ধনে মানুষ অহমিকা-পরায়ণ হইয়া পড়ে। এইপ্রকার নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সুদামা বিপ্র নিজ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যাইয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন তাঁহার ঘরবাড়ীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই! অমল-ধবল রাজ-প্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকার সম্মুখে শত শত দাসদাসী পরিবৃত হইয়া, নানা রত্নালঙ্কারভূষিতা এক মহিলা তাঁহাকে "এস এস প্রাণনাথ" বলিয়া ডাকিতেছে! সুদামা বুঝিলেন, ইহা আর কিছু নহে—সেই লীলাময়ের অনন্ত লীলার একটী লীলামাত্র। পত্নীকে লইয়া সুদামা মহাসুখে সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার ঘর আজ ধনধান্যে পূর্ণ। সুদামা কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে ডুবিয়া মহানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

শ্রীগুহরাজ

ভাগীরথী তীরে শৃঙ্গবের পুরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি নিষাদ-পতি ছিলেন।

মহাভারতকার বলিয়াছেন :—

"চণ্ডালোঽপি মুনি শ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

অর্থাৎ হরিভক্তিনিষ্ঠ চণ্ডালও মুনি শ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু হরিভক্তি শূন্য দ্বিজও চণ্ডালাধম। গরুড়পুরাণ বলিয়াছেন :—

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ,
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

অষ্টবিধা-ভক্তি যে ম্লেচ্ছে বিদ্যমান আছে, সে ম্লেচ্ছও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীযুক্ত, সেই যতি এবং সে পণ্ডিত। যাহা শ্রীহরিকে দেয়, তাহা সেই ম্লেচ্ছকে দিবে এবং যাহা শ্রীহরির সকাশ হইতে গ্রহণীয়, তাহা সেই ম্লেচ্ছের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেই ম্লেচ্ছও শ্রীহরির ন্যায় বন্ধু। ইতিহাস সমুচ্চয় বলেন :—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি কেহ শূদ্র, ব্যাধ অথবা চণ্ডাল প্রভৃতি সামান্য জাতির তুল্য দেখে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়।

ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

অর্থাৎ যাহারা কেবল মদীয় ভক্ত, হে পার্থ, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে; যাহারা মদ্ভক্তজনের ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে কথিত।

স্কন্দপুরাণে আছে :—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্তো জ্ঞেয়ো সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা তদপেক্ষা কোন ইতর জাতি যদি বিষ্ণুভক্তি-নিষ্ঠ হন, তিনিই সর্ব্বোত্তমোত্তম।

নারদীয় পুরাণ বলেন :—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্ত দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণু ভক্তি বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥"

বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তি শূন্য যতি চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন।

উপরোক্ত উক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই আমরা নিষাদরাজ গুহকের চরিত্রে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন,তাঁহার পরিধানে বসন নাই—আছে গাছের বল্কল,মাথায় সেই কুঞ্চিত কেশদাম নাই—তৎপরিবর্ত্তে জটাজুট! ভক্তবীর গুহরাজ কি ইহা সহ্য করিতে পারেন? জটাবল্কলধারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়াই গুহরাজ একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তখনই চতুরঙ্গ সেনা সজ্জিত করিবার আদেশ করিলেন। গুহরাজ ভরতকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রামচন্দ্রকে

অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র গুহরাজের ভাব দেখিয়া তাঁহার দুইখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "মিতা! ভরতের কোন দোষ নাই, সে আমার প্রাণের ভাই, সে আমাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে নাই, আমার পিতামাতারও কোন দোষ নাই। তুমি চৌদ্দটি বৎসর ধৈর্য্য ধরিয়া থাক,—দেখিবে আমি আবার অযোধ্যার রাজা হইব।" এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিদায় হইলেন, গুহরাজ ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় "হা রাম" "হা রাম" বলিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তখন গুহরাজের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা কবির কথাতেই বলিতেছি :—

"শ্রীরাম বিচ্ছেদে গুহরাজ মহাশয়।
গৃহে নাহি গেলা ভূমে পড়িয়া রহয়॥
আসন ভূষণ শয্যা আহার বিহার।
সব ত্যজি কৈল মাত্র রামনাম সার॥
পুনরায় কবে রামচন্দ্র আগমন।
হইবেক এইমাত্র দিবস গণন॥
চৌদ্দ বৎসর চৌদ্দ কল্প করি মানে।
নিরন্তর জলধারা বহয়ে নয়নে॥
রাম রাম মৈত্র হে সখা হে কোথায়।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ নহে বাহিরায়॥"

* * * * * * * *

কিন্তু এত করিয়াও গুহরাজ রামচন্দ্র-বিচ্ছেদ-শোক সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এবার তিনি স্থির করিলেন, অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল, গুহরাজ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হনুমান আসিয়া রামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা

জ্ঞাপন করিল। গুহক "কই আমার রামা মিতে কই" "কই আমার রামা মিতে কই" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে হনুমানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভগবানের জন্য ভক্তের প্রাণ এমনই আকুল হইয়া থাকে!

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

বিল্বমঙ্গল একজন ব্রাহ্মণের সন্তান। চিন্তামণি নামক এক বার-বণিতার প্রেমে বিল্বমঙ্গল এরূপ আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঘরের যাবতীয় ধনধান্য সমস্ত আনিয়া চিন্তামণির পাদপদ্মে অর্পণ করেন। একদিন বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি। সেদিন বড়ই দুর্য্যোগ। আকাশে মুহুর্মুহুঃ বজ্রনির্ঘোষ হইতেছে, ভীষণ করকাপাত আসন্ন প্রলয়ের সূচনা করিতেছে। নদীতে ভীম ভৈরব গর্জ্জনে উত্তাল-তরঙ্গ-মালাসমূহ বীচির উপর বীচি-মালায় জল-স্থল আলোড়িত করিতেছে! শন্ শন্ রবে মত্ত প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইতেছে! চারিদিকে অমা-নিশার সূচিভেদ্য অন্ধকার। কোলের মানুষ পর্য্যন্ত চিনিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? পিতৃশ্রাদ্ধের এই যে সুমিষ্ট মিষ্টান্ন, এই দধি, এই ছানা,—এ কি তাঁর চিন্তামণির রসনা তৃপ্ত করিবে না? বিল্বমঙ্গল আকাশের দিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকের উপর ঘনাইয়া আসিল। একে গগনে অচ্ছেদ্য, নিবিড় জলদমালার ঘোর অন্ধকার, তার উপর প্রদোষের প্রাকৃতিক অন্ধকার; উভয় অন্ধকারে



শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর। (২৬ পৃষ্ঠা)

মেদিনীকে একেবারে অমানিশার রজনীর ন্যায় তামিস্রাময়ী করিয়া তুলিল। ক্রমে একপ্রহর উত্তীর্ণ হইল, দ্বিপ্রহর রাত্রি হইল। অদূরে বনান্তরালে শৃগালগণ যামিনীর দ্বিপ্রহরত্ব ঘোষণা করিল। বিল্বমঙ্গল আর প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না—ছুটিয়া একেবারে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নদীতে একখানিও নৌকা নাই, অদূরে নদীর অপর পারে ঐ যে চিন্তামণির প্রকোষ্ঠে মিটি মিটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে! ঐ যে চিন্তামণির বাড়ীর অঙ্গনের দাড়িম্ব গাছটি কেমন শাখা প্রশাখারূপ বাহুবিস্তার করিয়া বিল্বমঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে, ঐ যে ঐ গবাক্ষের ভিতর দিয়া চিন্তামণি তাহার সুগোলবাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে! বিল্বমঙ্গল "চিন্তামণি" "চিন্তামণি" বলিয়া নদীতে ঝম্পপ্রদান করিলেন। তরঙ্গাভিঘাতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহার হাতে একটা শক্ত কি পদার্থ ঠেকিল। বিল্বমঙ্গল মনে করিলেন, নিশ্চয়ই এটা কোন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড! তাই ভাবিয়া বিল্বমঙ্গল সেই কাষ্ঠখণ্ডে আরোহণ করিলেন। দুইহাতে জল ঠেলিয়া বিল্বমঙ্গল তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। নদীতটে সেই কাষ্ঠখণ্ডকে রাখিয়া চিন্তামণির বাড়ীর দ্বারে গিয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে দ্বারের অর্গল বদ্ধ। এত দুর্য্যোগের রাত্রে কে তাঁহার জন্য জাগিয়া থাকিবে? বিল্বমঙ্গল "চিন্তামণি" "চিন্তামণি" করিয়া কত ডাকিলেন, কোন সাড়া-শব্দ পাইলেন না। প্রাচীরের পার্শ্বে গর্ত্তের মধ্যে মুখ দিয়া একটা বৃহৎ কালসর্প লেজ ঝুলাইয়া অবস্থান করিতেছিল, বিল্বমঙ্গল সেই ভুজঙ্গের লেজ ধরিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া লাফ দিয়া চিন্তামণির বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে হঠাৎ "ঢিপ্" করিয়া আওয়াজ হওয়ায় চিন্তামণি আঁলো হস্তে অঙ্গনে আসিয়া দেখে তাহার প্রেমের নাগর রসময় বিল্বমঙ্গল ঠাকুর উপস্থিত! বিল্বমঙ্গল পচা গলিত,

পূতিগন্ধময় শব আরোহণে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ দিয়া অতি দুঃসহ গন্ধ বাহির হইতেছিল, বিল্বমঙ্গলকে তদবস্থ দেখিয়া চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এত রাত্রে কেমন করিয়া আসিলে? বিল্বমঙ্গল বলিলেন, কেন? আমি একখণ্ড ভাসমান কাষ্ঠ ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে নদী পার হইয়াছি, আর তুমি আমার জন্য যে রজ্জু ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলে আমি সেই রজ্জু ধরিয়া প্রাচীরে উঠিয়া লাফ দিয়া তোমার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। চিন্তামণি কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, চল ত তোমার কেমন কাষ্ঠ আর কেমন রজ্জু একবার দেখিয়া আসি! দুই জনে নদীতটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বিল্বমঙ্গল অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইলেন, দেখ দেখ, ঐ কাষ্ঠখণ্ডে ভর করিয়া আমি নদী পার হইয়াছি। চিন্তামণি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল, ওমা আমার কি হ'বে গো! তোমার কি একেবারে ভীমরথী হইয়াছে! তারপর বাটীতে আসিয়া দেওয়ালের গায়ে রজ্জু দেখিতে গিয়া—চিন্তামণি দেখে যে তাহা এক প্রকাণ্ড কালসর্প! দেখিয়াই চিন্তামণি ভয়ে শিহরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে বাটীর মধ্যে যাইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে থাকিবার পর চিন্তামণি বলিল :—

"আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোতি ক্রিয়া অনুচিত॥
এ হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যদি হইত তোমার।
তবে কিনা হইত চতুর্ব্বর্গ সেবাচার॥"

চিন্তামণির কথাটা ঠিক যেন কর্ণের ভিতর দিয়া বিল্বমঙ্গলের প্রাণের

ভিতর যাইয়া সাড়া দিল। বিল্বমঙ্গল ভাবিলেন,তাই ত এই কৃমি-কীট-বিষ্ঠা-মূত্র পরিপূর্ণ স্ত্রীলোকের দেহের জন্য আমি যে ঐকান্তিকতা দেখাইতেছি, ইহার শতাংশের একাংশও যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার জীবন বুঝি ধন্য হইত! রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই—বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনাভিমুখে কোথা "চিন্তামণি" "কোথা চিন্তামণি" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন। বিল্বমঙ্গল চলিতেছেন, আজ তাঁহার হৃদয়ের স্রোত কামিনী-কাঞ্চনের মোহ ছাড়িয়া—যাকে পাইলে মানুষের অন্য বস্তুতে কামনা থাকে না, সেই বস্তুর দিকে ধাবিত হইয়াছে! পথে কত কণ্টক, কঙ্কর রহিয়াছে, বিল্ব-মঙ্গল ঠাকুরের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কয়েকদিন বন হইতে বনান্তর অতিক্রম করিয়া এক গ্রামের সরোবর তীরে গিয়া উপবেশন করিলেন; তখন মধ্যাহ্নকাল। মাথার উপর সবিতৃদেব ভাস্বর কিরণ-মেখলায় দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়াছেন। দলে দলে কামিনীকুল সরোবরে স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে গৃহে ফিরিতেছেন। তন্মধ্যে একটী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী বধূকে দেখিয়া বিল্বমঙ্গলের কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বহুদিনের সুপ্তসিংহ আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই বধূটী আর কেহ নহেন—একজন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর গৃহিণী। বিল্ব-মঙ্গল সেই বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপবেশন করিলেন। অভুক্ত সাধুকে তদবস্থায় দেখিয়া শ্রেষ্ঠী আসিয়া তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বিল্বমঙ্গল বলিলেন, দেখ শ্রেষ্ঠি! তোমার অনিন্দ্যসুন্দরী ভার্য্যাকে দেখিয়া আমার মনে বড় অভিলাষ জন্মিয়াছে যে, আমি তাঁর সহিত নির্জ্জনে একরাত্রি যাপন করি। যদি তুমি তোমার পত্নীকে এক রাত্রির জন্য আমার সহিত বাস করিবার অনুমতি দেও—তবেই তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব—নতুবা নহে।

শ্রেষ্ঠী অতি ধার্ম্মিক ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। জীবনে কোনদিন তাঁহার দ্বার হইতে অতিথি বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। আজ কি এতদিন যাহা হয় নাই তাহাই হইবে? কিন্তু অতিথির এ কি বিচিত্র প্রস্তাব! স্বামী হইয়া কোথায় স্ত্রীর সতীত্ব ও ধর্ম্মরক্ষা করিব—তাহা না করিয়া নিজ হাতে স্ত্রীকে একটা কামান্ধ অতিথির হাতে সমর্পণ করিতে হইবে! কিন্তু উপায় কি? না দিলে যে অতিথি হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে! শ্রেষ্ঠীর আজীবনের পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইবে। শাস্ত্রে বলে,অতিথি "সর্ব্বদেবময়।" বেশ আজ অতিথিরূপ দেবতার সেবাতেই স্ত্রীকে অর্পণ করা যাউক। ইহা ভাবিয়া শ্রেষ্ঠী অতিথির প্রস্তাবে রাজী হইলেন। বিল্বমঙ্গল আহারান্তে কোন সময় রাত্রি হইবে আর কোন্ সময় তিনি শ্রেষ্ঠি-পত্নীর বিম্বাধরে আপন অধর মিশাইয়া স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন দিনমণির দিকে তাকাইয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছেন! ক্রমে রাত্রি হইল। একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বিল্বমঙ্গলকে রত্নখচিত পালঙ্কে উপবেশন করিতে দেওয়া হইল। প্রতিমুহূর্ত্তে বিল্বমঙ্গল শ্রেষ্ঠী-পত্নীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই ভাবিতে লাগিলেন তবে কি শ্রেষ্ঠী তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিল? ক্রমে পরিচারিকারা আসিয়া খট্টাঙ্গের উপর দিব্য দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতিয়া দিয়া গেল— শয্যার উপর সুগন্ধি কুসুম বর্ষণ করা হইল—গোলাপ কুঙ্কুম,অগুরু চন্দনের সুগন্ধে প্রকোষ্ঠটি ভরপূর হইয়া উঠিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ বিকাশের মত নানা রত্নালঙ্কার-ভূষিতা শ্রেষ্ঠিপত্নী আসিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। অতিথিকে সভক্তিতে প্রণাম করিয়া শ্রেষ্ঠি-পত্নী মুক্ত অবগুণ্ঠনে বিল্বমঙ্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ঠাকুর, দেবতা, আজ আমি আপনার অঙ্কশায়িনী হইবার মানসে আসিয়াছি, এখন আমার

এই দেহ লইয়া আপনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তখন বিল্বমঙ্গল সেই শ্রেষ্ঠি-পত্নীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, ওরে মূঢ়মন! এত করিয়াও তোর ভোগলালসা দূর হইল না! কি দেখ্ছিস্ সম্মুখে? এই যে সুন্দরী যুবতী—ইহার দেহ ত কৃমি-বিষ্ঠা, মূত্র-নিষ্ঠীবনে পরিপূরিত! ইহার এই ঘৃণ্য দেহের প্রতি এখনও কি তোর মোহ গেল না। না—না—এ চক্ষু আর রাখিব না, এই চক্ষু দুইটাই আমার সমস্ত নষ্টের মূল। এই ভাবিয়া বিল্বমঙ্গল সেই শ্রেষ্ঠি-পত্নীকে দুইটা সূচ আনিতে বলিলেন। শ্রেষ্ঠি-পত্নী সূচ আনিলে বিল্বমঙ্গল আপন হাতে তাহা চক্ষে ফুটাইয়া একেবারে অন্ধ হইলেন। অতঃপর "মা—মা" বলিয়া শ্রেষ্ঠি-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে সেই সরোবর তীরে রাখিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রেষ্ঠি-পত্নী তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে সরোবর তীরে রাখিয়া আসিলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক রাখাল বালকের বেশ ধরিয়া বিল্বমঙ্গলকে পথ দেখাইয়া বৃন্দাবনে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে একবার বিল্বমঙ্গল সেই বালকের হস্ত ধরিয়া যেমন বুকে ধরিতে যাইবেন, অমনি বালক হস্ত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গল বলিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার হাত ছিনাইয়া যাইতেছ—তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমার হৃদয় হইতে যদি বাহিরে যাইতে পার, তবেই তোমার পৌরুষ গণি।

তখন কৃষ্ণরূপী রাখাল বালক তাঁহাকে বলিলেন,—"দেখ, আমার

এই ছায়া দেখিয়া তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস। বিল্বমঙ্গল বলিলেন, তাও কি হয় বালক, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমি সেই বৃন্দাবন-বিহারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, একবার মোহনমুরলী ধরিয়া আমাকে তেমনি বংশী হাতে লইয়া দেখা দেও। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার এই কালরূপ আর তুমি কি দেখিবে? তুমি অন্য কোন বর যাচ্ঞা কর, আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি। তখন বিল্বমঙ্গল বলিলেন, আমার আর কোন বর প্রার্থনা নাই, যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই দয়া হয় তবে আমার চক্ষু দুইটি আমাকে ফিরাইয়া দেও, আমি একবার তোমার ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠাম মোহনমুরলী মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দর্শন করি। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদ্মহস্ত বিল্বমঙ্গলের চক্ষে বুলাইলেন, বিল্বমঙ্গল দিব্য চক্ষু লাভ করিলেন। বিল্বমঙ্গল সেই নব চিদ্‌ঘন-রূপরাশি দেখিয়া ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তুলিয়া অন্ন দুগ্ধাদিতে সুস্থ করিলেন। বিল্বমঙ্গল অতঃপর বৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতে লাগিলেন; আর সেই রাখাল বালক প্রতিদিন তাঁহাকে দুগ্ধ-ফলমূল-অন্নাদি দিয়া যাইত। কিছুদিন পরে চিন্তামণি বেশ্যাও অনুতাপের শত বৃশ্চিকদংশনে দষ্ট হইয়া "হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ চিন্তামণি আর সে চিন্তামণি নহে। তাহার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গিয়াছে। যেখানে দৈহিক ভোগসুখ ছিল—চিন্তামণির জীবনের লক্ষ্য আজ সেই জীবনের তৃষ্ণা কেবল "চিন্তামণি"কে পাইবার জন্য। চিন্তামণির মাথায় আর সে আগুলফ—লম্বিত কৃষ্ণ কুন্তলদাম নাই—পরিধানে আর সে নয়ন-মনোলোভা সূক্ষ্ম পট্ট-বস্ত্র নাই—অঙ্গে আর সে সুবর্ণ বলয়-হার প্রভৃতি নাই। চিন্তামণি আজ আলুলায়িতকেশা

গৈরিক-বসনা, নিরাভরণা, উন্মাদিনী, সন্ন্যাসিনী। বহু কষ্টে নানা নদ-নদী তড়াগ অটবী অতিক্রম করিয়া চিন্তামণি বৃন্দাবনে আসিয়াছে। আসিয়াই বিল্বমঙ্গলের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল,—ঠাকুর তুমি ত সেই কেলে-সোণার সাক্ষাৎ পাইয়াছ—একবার আমার বাসনা চরিতার্থ কর। চিন্তামণিব আশা পূর্ণ হইল—অচিরাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহন-পীতবাস পরিয়া, চরণে নুপূর দিয়া, মস্তকে মোহন চূড়া বাঁধিয়া, গলে বনমালা দিয়া চিন্তামণিকে দেখা দিলেন। বার-বণিতা চিন্তামণি আজ স্পর্শমণি সংযোগে লৌহ যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, তেমনি মহাতপস্বিনীতে পরিণত হইল।

শ্রীজয়দেব গোস্বামী

বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে অনুমান খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামদেবী। ইনি অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর জন্ম হয়। তিনি পুরুষোত্তমে যাইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া কেবল "হা কৃষ্ণ" "জীবন কৃষ্ণ" করেন। এদিকে এক ব্রাহ্মণের কোন মতে সন্তানাদি না হওয়ায় ব্রাহ্মণ জগন্নাথদেবের নিকট "হত্যা" দিয়া নিবেদন করে যে, যদি তাঁহার কোন সন্তান হয়, তবে জগন্নাথদেবের সেবায় তাহাকে অর্পণ করিবে। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণের একটী কন্যা

হইল, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে আনিয়া অর্পণ করিল। জগন্নাথ ব্রাহ্মণকে স্বপ্নযোগে বলিলেন, এই কন্যাটিকে আমার জয়দেব নামক যে ভক্ত গাছতলায় বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছে তাহার করে অর্পণ কর। সে আমার ভক্ত, তোমার কন্যা তাহার "দাসী" হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে লইয়া জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জগন্নাথদেবের আজ্ঞা নিবেদন করিলেন; জয়দেব শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, ভগবন্! এ আবার তোমার কি লীলা! আমি সংসার-মুক্ত—আমাকে আবার সংসারপাশে বাঁধিবার জন্য এ আজ্ঞা কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, আমি এ কামিনী লইয়া কি করিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তাহা হইবে না ঠাকুর! জগন্নাথদেবের আজ্ঞা, সে আজ্ঞা আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে জয়দেবের কাছে থাকিতে আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কন্যাটিকে বলিলেন, তুমি কেন বৃথা আমার কাছে বসিয়া রহিয়াছ? এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও, আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কন্যাটির নাম পদ্মা। সে কাঁদিয়া কহিল, পিতা আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আর জগন্নাথদেবও আদেশ করিয়াছেন. তুমিই আমার স্বামী; অতএব আমাকে তোমার চরণে স্থান দিতেই হইবে। তুমি যদিও আমাকে ত্যাগ কর, আমি কখনও তোমাকে ছাড়িব না, তোমার চরণ-সেবা করিবই করিব। তখন জয়দেব ভাবিলেন, জগন্নাথদেবের আজ্ঞা যখন. তখন আদেশ পালন করিতেই হইবে। তিনি পদ্মাকে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি একখানি কুঁড়ে নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রাধামাধব ঠাকুরের সেবায় তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন। কিছু

দিন পুরুষোত্তমে অবস্থান করিয়া জয়দেব পদ্মাবতী সহ কেন্দুবিল্বে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" নামক ভক্তি-রসাত্মক অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিলেন। কিন্তু শ্লোকের একটী চরণ আর জয়দেব কোন মতে মিলাইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ রাধার চরণে পতিত হইয়াছিলেন, এ কথা ভক্ত জয়দেব কেমন করিয়া লিখিবেন? তিনি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া স্নান করিতে নদীতে গেলেন। ইত্যবসরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জয়দেবের মূর্ত্তি ধরিয়া পদ্মার নিকট আসিয়া বলিলেন, দেখ পদ্মা, পথে যাইতে যাইতে শ্লোকের শেষ অংশটুকু মনে পড়িল। এই বলিয়া মস্যাধার লইয়া জয়দেব-বেশী শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই শ্লোকটুকু লিখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান চলিয়া যাইবামাত্র জয়দেব নদী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পদ্মা বিস্মিত হইয়া বলিল, এ কি! তুমি কি ভোজবাজীর পুতুল না কি! এই যে এইমাত্র তুমি বই খুলিয়া শ্লোক লিখিয়া গেলে, ইহার মধ্যে একক্রোশ পথ হাঁটিয়া কিরূপে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে? জয়দেব বলিলেন, সে কি! দেখি দেখি পাণ্ডুলিপিতে কি লেখা হইয়াছে! এই বলিয়া জয়দেব পাণ্ডুলিপি খুলিয়া দেখেন, যাহা তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন অথচ সাহস করিয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন নাই, সেই "দেহি পদপল্লবমুদারম্" কথা লেখা হইয়াছে। তখন জয়দেব পদ্মাবতীর কখনও গলায়, কখনও পায়ে ধরিয়া বলিলেন, পদ্মা, পদ্মা, তুমি অতি ভাগ্যবতী, আমি এতদিন দিবানিশি ডাকিয়া ডাকিয়া যে ধনের সাক্ষাৎ পাই নাই, আজ তুমি স্বচক্ষে সেই ধনকে দেখিতে পাইয়াছ!

ক্রমে গীতগোবিন্দের সুযশ সমস্ত ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীক্ষেত্রের রাজা ইহা দেখিয়া নিজে একখানি গীতগোবিন্দ রচনা

করিলেন। রাজা সেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও নিজের গীতগোবিন্দ লইয়া জগন্নাথদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রভু জয়দেবের গ্রন্থ বুকে করিয়া রাখিলেন, আর রাজার কৃত গীতগোবিন্দ পায়ে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তখন রাজা অভিমানে সমুদ্রের জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন। জগন্নাথদেব রাজাকে ধরিয়া বলিলেন—দেখ, জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথমে তোমার রচিত বারটি শ্লোক থাকিবে।

আর একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধারণ করিয়া পদ্মার স্বহস্তে পাক করা অন্ন খাইয়াছিলেন। একবার জয়দেব, ঠাকুর সেবার জন্য বঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া টাকাকড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে দস্যুগণে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। দস্যুদের মধ্যে কেহ বলিল, ইহার প্রাণনাশ করা হউক, নতুবা এ দেশে ফিরিয়া আমাদিগকে ধরাইয়া দিবে, কেহ বলিল, ইহার হাত পা কাটিয়া কূপে ফেলিয়া দেওয়া হউক। শেষে তাহাই হইল। জয়দেবের হাত পা কাটিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দস্যুরা চলিয়া গেল। জয়দেব সেই কূপের মধ্যে পড়িয়া "হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হইলে, অকস্মাৎ এক রাজা মৃগয়ার্থ সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে কূপের মধ্যে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ধ্বনি শুনিয়া জয়দেবকে তুলিয়া আনিয়া শিবিকায় করিয়া নিজ রাজ-প্রাসাদে আনিলেন। জয়দেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার তপ্ত গৌরকান্তি দেখিয়া রাজা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এই সাধু নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন। অতঃপর একদিন রাজা জয়দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোনও মনোবাঞ্ছা আছে? জয়দেব বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় দেশে যত সাধু-বৈষ্ণব আছে, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া ভূরি ভোজন করাই। রাজার আদেশে

অনতিবিলম্বে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হইল, দেশে যেখানে যত বৈষ্ণব ছিল সকলে আসিয়া রাজবাড়ীতে ভূরি ভোজন করিতে লাগিল। এদিকে সেই দস্যুগণও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাজবাড়ীতে আসিয়া আহারে বসিল। জয়দেব তাহাদিগকে দেখিয়া রাজার প্রতি আদেশ করিলেন, "এই কয়েকজন বৈষ্ণবকে যেন অতি সমাদর করা হয় এবং ইঁহাদিগকে যেন অনেক দিন রাজবাড়ীতে রাখিয়া তারপর বহু অর্থ কড়ি দিয়া বিদায় দেওয়া হয়!" জয়দেবের আদেশানুসারে রাজা নিজে সেই সাধুবেশধারী দস্যুগণকে মহা সমাদর করিয়া আহারাদি করাইলেন। ক্রমে মহোৎসব শেষ হইল, অপরাপর বৈষ্ণবেরা সকলে একে একে চলিয়া গেল, দস্যুগণ যাইবার জন্য অতি-মাত্রায় ব্যস্ত হইল, কিন্তু রাজা বলিলেন, সাধু বাবাজীর (জয়দেবের) আদেশ ব্যতীত তোমাদিগকে কোন মতে যাইতে দিতে পারি না। সাধুরা এইবার মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল নিশ্চয়ই জয়দেব তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে এবং এইবার তাহাদের হাত পা কাটিয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইবে। দস্যুরা দ্বারে যাইল, মতলব—পলাইয়া যাইবে। কিন্তু দ্বারবানেরা তাহাদিগকে ছাড়িল না। তখন তাহাদের মনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে নিশ্চয়ই সাধুর আদেশে তাহাদিগকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ান হইবে। দস্যুরা কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার নিকট গিয়া বলিল, রাজা মহাশয়, সকল বৈষ্ণব বৈষ্ণবী চলিয়া গেল, আমাদিগকে কেন এখনও যাইতে দেওয়া হইতেছে না। রাজা মহাশয় বলিলেন, আমি কি করিব? সাধু মহান্ত বাবাজীর যে আদেশ আমাকে তাহা পালন করিতেই হইবে। এই বলিয়া রাজা জয়দেবের নিকটে গিয়া দস্যুরূপী সাধুদের নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন। জয়দেব বলিলেন, উহাদিগকে যথাযোগ্য সমারোহ

সহকারে বিদায় অভিনন্দন করিয়া রাজকীয় ভৃত্যাদির সহিত বহু টাকা-কড়ি দিয়া তাহাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হউক। রাজা তাহাই করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রাজার ভৃত্যেরা সাধুরূপী দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এত বৈষ্ণব থাকিতে তোমাদের এত আদর যত্ন করা হইল কেন? তদুত্তরে দস্যুরা বলিল, দেখ, আমরা এক রাজবাড়ীতে ভৃত্য ছিলাম, ঐ সাধুটীও সেই রাজবাড়ীতে ছিল। কোন একটা গুরুতর অপরাধ করায় রাজা উহাকে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। আমরা উহাকে মারিবার জন্য নিবিড় বনে লইয়া যাই, কিন্তু উহার কাকুতি-মিনতিতে আমাদের দয়ার উদ্রেক হওয়ায় উহার হাত পা কাটিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসি। ঐ বেটা এখানে আসিয়া মহাত্ম সাজিয়া বসিয়াছে। পাছে আমরা উহার পূর্ব্ব কথা প্রকাশ করিয়া দিই, এই ভয়ে আমাদিগকে এই প্রচুর ধন দিয়া বিদায় করিয়াছে। রাজ-ভৃত্যগণ কিন্তু তাহাদের কথা শুনিয়া আদৌ প্রসন্ন হইল না। দস্যুগণ যেই এই কথা শেষ করিল, অমনি অকস্মাৎ তাহারা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল তাহা বিদীর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দস্যুগণ ভূতল সমাধি লাভ করিল। রাজ-ভৃত্যগণ আসিয়া দস্যুদের কথা রাজ-সকাশে বর্ণনা করিল। রাজা জয়দেবকে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়দেব আমূল পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন, এই দস্যুগুলি যাহাতে পুনর্ব্বার টাকার জন্য আর কাহারও জীবননাশে উদ্যত না হয়, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ অজস্র অর্থ দিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে জয়দেবের হস্তপদ আবার পূর্ব্বেকার মত হইল। রাজা ভগবদ্ভক্তের মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

রাজা শুনিয়াছিলেন, জয়দেবের পদ্মাবতী নামে এক সহধর্ম্মিণী আছেন। তিনিও সদাসর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করেন। রাজা সেই কথা শুনিয়া পদ্মাবতীকে নিজের পুরীতে আনাইলেন। রাজার স্ত্রীর ভ্রাতা মারা গিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে ভ্রাতৃপত্নীও সহ-মরণে গিয়াছিলেন। রাণী সেই কথা পদ্মার নিকট গল্প করিতে করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, পদ্মা কেমন পতিব্রতা নারী একবার তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। এই স্থির করিয়া রাণী রাজাকে বলিলেন, দেখ সাধুর পত্নী কিরূপ পতিপরায়ণা একবার তাহার পরীক্ষা লইতে হইবে। তুমি ত সাধুর সহিত উদ্যানের মধ্যে অনেক সময় থাক, আজ আসিয়া পদ্মার নিকট সাধুর মৃত্যু সংবাদ দিবে। রাজা সম্মত হইয়া উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মার নিকট জয়দেবের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পদ্মা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। রাণী ও রাজা দুইজনেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজা যাইয়া জয়দেবের নিকট এই দারুণ সংবাদ দিবামাত্র জয়দেব হাসিয়া বলিলেন, "তাতে আর কি হইয়াছে? একবার কৃষ্ণনাম কাণে গেলেই জীবিত হইয়া উঠিবেন।" সত্যই তাহা হইল। জয়দেব পদ্মার নিকট যাইয়া একবার কৃষ্ণ নাম করিতেই পদ্মা চেতনা লাভ করিলেন। রাজা ও রাণীর শুষ্ক মুখে আবার হাসি ফুটিল। অতঃপর কিছুদিন রাজবাটীতে অবস্থান করিয়া জয়দেব আবার পুরুষোত্তমে গেলেন। তথায় যাইবার পর বৃন্দাবনে যাইবার জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ হইল। জয়দেব রাধামাধব বিগ্রহ নিজের ঝুলির মধ্যে লইয়া বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে কেশীঘাটে তিনি রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একজন ধনাঢ্য ভক্ত কেশীঘাটে রাধামাধব

জিউর জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া জয়দেব বিগ্রহসহ জয়পুরে চলিয়া গেলেন। তথায় "ঘাটি" নামক স্থানে অদ্যাবধিও জয়দেবের সেই বিগ্রহ দেবতা বিরাজ করিতেছেন।

জয়দেবের অপার মহিমার কথা আর কত কহিব? কেন্দুবিল্ব হইতে গঙ্গা অষ্টাদশ ক্রোশ। প্রতিদিন জয়দেব এই আঠার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন তিনি কোন মতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে না পারিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরদিন স্বয়ং গঙ্গা কেন্দুবিল্বের সন্নিধানে আসিয়া জয়দেবকে স্নান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। এইভাবে ভক্তের মহিমা জগতে প্রচার করিয়া জয়দেব ভক্ত-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

প্রহ্লাদ।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিত বদ্ বৈয়াসকির কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুপূজনে।
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি বেষাং পরম্॥

অর্থাৎ পরীক্ষিত শ্রীহরির নাম শ্রবণে, ব্যাসাত্মজ শুকদেব তাঁহার নাম কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তদীয় স্মরণে, লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবনে, পৃথু



প্রহ্লাদ। (৪০ পৃষ্ঠা)

তদীয় পূজনে, অক্রূর তাঁহার অভিনন্দনে, কপিরাজ হনুমান তাঁহার দাসত্বে, অর্জ্জুন তাঁহার সখ্যতায় এবং বলিনৃপতি সর্ব্বস্বদানে ও আত্ম-নিবেদনে, সেই পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু নামে কৃষ্ণদ্বেষী রাজার পুত্র। পাঠশালে প্রহ্লাদকে রাজা বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। প্রহ্লাদ "ক" লিখিতে গিয়া লিখে "কৃষ্ণ"—"ক" পড়িতে গিয়া বলে "কৃষ্ণ"। রাজা প্রহ্লাদকে কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিবার জন্য কত বুঝাইলেন—কত প্রবোধ দিলেন, প্রহ্লাদ কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। ষণ্ডামার্ক নামে এক গুরুমহাশয় ছিল। তার নামও ষণ্ডামার্ক—কাজেও ষণ্ডামার্ক। হিরণ্যকশিপু উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রহ্লাদকে ষণ্ডামার্কের হস্তে অর্পণ করিলেন। ষণ্ডামার্কের নিকট প্রহ্লাদ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তারপর যেই ষণ্ডামার্কের ঘর হইতে চলিয়া আসে অমনি "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকে। কিছুদিন পরে প্রহ্লাদকে ঘরে আনিয়া ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন গুরুগৃহে থাকিয়া কি বিদ্যা শিখিয়াছ বাবা! প্রহ্লাদ বলিল,—

"সেই বিদ্যা হয় সর্ব্ব বিদ্যা মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেই সে উৎকৃষ্ট॥
অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যা চূড়ামণি।
ইহা ভিন্ন আর যত অর্থে না বাখানি॥"

ভক্তমাল ৮২ পৃঃ।

রাজা প্রহ্লাদের মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া টান মারিয়া তাহাকে ক্রোড় হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর ক্রোধান্ধ নয়নে ষণ্ডামার্কের দিকে তাকাইয়া রাজা বলিলেন, এই বুঝি তুমি আমার

পুত্রকে শিখাইয়াছ? ষণ্ডামার্ক কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, মহারাজ! আমার কোন অপরাধ নাই, আমি সর্ব্বদা ইহাকে চোখে চোখে রাখিয়া বর্ণমালা পড়াইয়াছি, এ যে কোন্ অবসরে আপনার শত্রুর নাম শিখিয়াছে তাহা ত আমি জানি না মহারাজ! হিরণ্যকশিপু এবার ষণ্ডামার্ককে সাবধান করিয়া প্রহ্লাদকে তাহার সহিত পাঠাইলেন। ষণ্ডামার্ক যতক্ষণ উপস্থিত থাকে ততক্ষণ প্রহ্লাদ শুধু চুপ করিয়া থাকে, যেই সে একটু চোখের আড়াল হয়, অমনি "হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। তাহার সহতীর্থগণ পর্য্যন্ত তাহার নিকট কৃষ্ণ মাহাত্ম্য শুনিয়া সকলে কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। ষণ্ডামার্ক ঐ সব বালকগণকে ধমক দিয়া চুপ করাইলেন বটে, কিন্তু প্রহ্লাদ আর থামে না। গুরু ষণ্ডামার্ক কত ধমক দেয়, প্রহ্লাদ দুই চোখে জল ফেলিয়া কেবল কাঁদিতে থাকে। ষণ্ডামার্ক মনে করে প্রহ্লাদ বুঝি তাহার ভয়ে কাঁদে। তখন ষণ্ডামার্ক তাহাকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কাঁদিতে নিরস্ত করে। প্রহ্লাদ তা শুনে না। এইরূপে আরও কিছুদিন গেল। রাজা ষণ্ডামার্ককে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, ষণ্ডামার্ক প্রহ্লাদকে সঙ্গে লইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা সযত্নে প্রহ্লাদের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বল দেখি বাবা, গুরুগৃহে থাকিয়া কি শিখিয়াছ? প্রহ্লাদ বলিল,—

"নীতি আর ধর্ম্ম যত, ধনুর্ব্বিদ্যা আদি শত,
রাজ্য আর জয় পরাজয়।
সকলি কেবল ব্যর্থ, সংসার হেতু অনর্থ,
যাতে কৃষ্ণে মতি না জন্মায়॥
এই যে সংসার সুখ, পরিণামে দুঃখোন্মুখ,
হেন রাজ্য সুখে কিবা কাজ

সেই সুখ রাজ্যাস্পদ,   সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যমদ,
সেই বিদ্যা রিপু পরাজয়।
সম্পদের সার সেই,   সেই তপ তীর্থ সেই,
যদি কৃষ্ণ ভক্তি উপজয়॥

ভক্তমাল ৮৭ পৃঃ।

প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া রাজা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জল্লাদকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। জল্লাদ শাণিত খড়্গ দিয়া প্রহ্লাদের গলদেশে আঘাত করিল, কিন্তু অস্ত্র ফিরিয়া আসিল। প্রহ্লাদের গায়ে একটুও ব্যথা লাগিল না। অতঃপর পর্ব্বতের উপর লইয়া প্রহ্লাদকে ছুড়িয়া ফেলা হইল, প্রহ্লাদের দেহে একটুও আঘাত লাগিল না। রাজা শুনিয়া ভাবিলেন,—একি ভৌতিক বিদ্যা জানে নাকি? রাজার আদেশে অতঃপর তাহাকে জ্বলন্ত হুতাশনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে দেখা গেল যেমন প্রহ্লাদ তেমনি প্রহ্লাদ হৃষ্টচিত্তে বসিয়া কৃষ্ণনাম গান করিতেছে। এবার হিরণ্যকশিপু উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল, ভীষণ কুম্ভীর নক্রাদি পরিপূর্ণ সাগরজলে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদের জীবননাশ করিতে সঙ্কল্প করিল। দূতগণ প্রহ্লাদের বুকে শিলা বাঁধিয়া মধ্য সমুদ্রে লইয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিল, প্রহ্লাদ ডুবিল না। তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডাকিয়া আনিয়া রাণীর কাছে পাঠাইল, মনে ভাবিল রাণী কয়াধুর উপদেশে প্রহ্লাদের মন হইতে কৃষ্ণভক্তির বীজ লুপ্ত হইবে। কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল। রাণী কয়াধু প্রহ্লাদকে নানা সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া ও মিষ্টান্নাদিতে পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন, বাবা হরিনামে মাতিয়াছ, বেশ করিয়াছ,' সংসারে হরিনাম ছাড়া আর কি আছে রে বাপধন! রাত্রে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ বৎস,

আমি যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করি, তুমি কদাচ তাহাকে ভজনা করিও না। প্রহ্লাদ বলিল ঃ—

"মহারাজ হরিধন অভয় শরণ।
কাপুরুষ যেই জন, না ভজয়ে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক ভুঞ্জন।
তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে নিন্দিত সেই
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম!
সংসার যাতনা ভোগ, সদা সেবে রোগ-শোক,
কদাচিৎ পূর্ণ নহে কামী।
অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ দুজা,
ভজ হরির অভয় চরণ।
বিষয়ে যে কুটিনাটি, ছার অন্য পরিপাটি,
সদা কর অনন্য শরণ॥"

প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া বলিলেন, হতভাগা, পিতৃদ্রোহী, কেবল যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিস্, বল্ দেখি, সে কৃষ্ণ থাকে কোথায়? প্রহ্লাদ বলিল ঃ—

"স্থাবর জঙ্গম কীট, পতঙ্গ পাবক ভীট—
চরাচর সভার অন্তরে।"

"বটেরে দুরাত্মা! যদি তাই হয়, তবে এই স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যে তোর কৃষ্ণ আছে?" "হাঁ আছেন বৈকি—তিনি যে সর্ব্বময়।" হিরণ্যকশিপু খড়্গ দিয়া সেই স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করিল, অমনি সেই স্ফটিকস্তম্ভ হইতে মোহন মুরলীধারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বাহির হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি বিকট করালমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জলস্থল আকাশ অন্তরীক্ষ সমস্ত পরিব্যাপ্ত করিল। সেই নরসিংহ বিকটমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য

করিয়া হিরণ্যকশিপু ও তাহার সৈন্য-সামন্তেরা মুদ্গর, মুষল, ভেলা প্রভৃতি ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। প্রভু তাহা দুই হাতে ধরিয়া—একে একে অসুরগুলাকে নিপাত করিলেন। তারপর হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া গাছের পাতার মত ছিড়িয়া ফেলিলেন, তাহার উদরের নাড়ীগুলা দিয়া মালা করিয়া গলে পরিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়া স্বর্গে দেবগণ পর্য্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, আবার বুঝি মহাপ্রলয় হয়। এ দিকে দেবগণ নানা স্তবস্তুতি করিয়া প্রভুকে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদের শরণাপন্ন হইলেন। প্রহ্লাদ নির্ভীকচিত্তে যাইয়া প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হইতেই প্রভু প্রহ্লাদকে কোলে লইলেন। প্রহ্লাদের অঙ্গে আপন পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাহাকে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। জগৎ শান্ত হইল। ভক্তের মহিমা অটুট রহিল। অসুর-রাজ হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হইতে লোকে অব্যাহতি লাভ করিল।

শ্রীবলি মহারাজ

ইনি বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম বিরোচন। ইনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে এক মহা পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠেন। ত্রিলোক জয় কামনায় ইনি যুদ্ধার্থে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। ইনি ন্যায়ানুমোদিত ভাবে রাজ্য-শাসন করিতেন এবং প্রায়শঃ যাগ-যজ্ঞাদির

অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। দেবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার জন্ত প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কশ্যপের ঔরসে বামনরূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। অতঃপর মহারাজ বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে বামনদেব তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দান প্রার্থনা করেন।

মহারাজ বলি জগতের মধ্যে অন্যতম। একদা মহারাজ বলি যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং বামন ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া বলির যজ্ঞেতে উপস্থিত হইলেন। বলি মহারাজ তাঁহার বিশেষ সমাদর করিয়া পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক রত্ন-সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইলেন। তারপর মহারাজ ব্রাহ্মণের আগমন উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি যাহা চাহি যদি তাহা দান কর, তবে আমার অভিলাষ তোমায় জানাইতে পারি। মহারাজের পার্শ্বে গুরুদেব শুক্রাচার্য্য বসিয়াছিলেন। তিনি বামন ব্রাহ্মণের প্রশ্নের ভাব দেখিয়াই বুঝিয়া-ছিলেন, এ ব্রাহ্মণ নিতান্ত সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন, নিশ্চয়ই কোন দেবতা আজ বলিকে ছলনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বারংবার বলিকে নিষেধ করিলেন, তিনি যেন ব্রাহ্মণের নিকট কোনরূপ প্রতিশ্রুতি না দেন। কিন্তু দানবীর মহারাজ বলি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ধনরত্ন প্রার্থনা করিতেছেন বলুন, আপনার আশা নিশ্চয়ই পূরণ করিব। ব্রাহ্মন বলিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট কোন ধনরত্নের প্রয়াসী নহি; কেবল যোগের জন্য একটু স্থান চাই। বলি তাহাতে সম্মত হইলেন। শুক্রাচার্য্য বলিকে বলিলেন, "মহারাজ, এখনও সাবধান হও, জান না কি অনর্থ তুমি ঘটাইতেছ? আমার কথা যদি না শুন, তবে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে।"

বলি গুরুদেবের এই সতর্ক বাণীতেও গ্রাহ্য করিলেন না। রাণী বিন্ধ্যাবলী আসিয়া বলিলেন, মহারাজ গুরুদেবের অভিশাপে আমাদের যাহা হইবার তাহা হউক, তাহাতে দুঃখ নাই, আপনি অচিরাৎ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। এই বলিয়া বিন্ধ্যাবলী নিজে ব্রাহ্মণের পদযুগলে জল-বর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর মহারাজ স্বয়ং সেই পদদ্বয় ধৌত করিয়া তাহা বক্ষে রাখিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য মহারাজের আসন্ন সর্ব্বনাশ উপলব্ধি করিয়া জলের ঝারির মধ্যে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিয়া জলের নিষ্ক্রমণ পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ঝারি হইতে জল নিষ্ক্রমণ হইতেছে না দেখিয়া রাজা একগাছি "কুশা" লইয়া ঝারির মুখে দিলেন, তাহার আঘাতে শুক্রাচার্য্যের একটি চক্ষু বিনষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর ব্রাহ্মণের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া রাজা তাঁহাকে ত্রিপাদধরণী দান করিলেন। অতঃপর সেই বামন ব্রাহ্মণ হঠাৎ বিরাটকায় হইলেন। তাঁহার পদদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নভোস্থল স্পর্শ করিল; তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, ওগো মহারাজ! আমার তৃতীয় চরণ রাখিবার স্থান কোথায়? তখন বলি বলিলেন, ঠাকুর, আর কোথায় স্থান দিব, আর ত স্থান নাই। তখন ঠাকুর বলিলেন, যেমন তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে সেই হেতু তোমাকে আমি বন্ধন করিতেছি। বলি আনন্দে সেই বন্ধন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, যদি প্রভুর দয়া হয়, তবে আমার মস্তকের উপর আপনার পদযুগল রাখুন। ঠাকুর বলির মস্তকে পদদ্বয় স্থাপন করিয়া তাহা নামাইয়া লইয়া প্রেমালিঙ্গনে বলিকে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আজ তোমার ভক্তিভাব দেখিয়া আমি পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তুমি আমার প্রিয় হইতেও প্রিয়তম। অতঃপর ঠাকুর দেবশিল্পকারকে আদেশ করিলেন যে পাতালপুরীতে অমরাবতীর ন্যায় একটী পুরী নির্ম্মাণ

কর। তাঁহার আদেশ অচিরাৎ প্রতিপালিত হইল। সেইখানে বলিকে লইয়া এক রত্নময় সিংহাসনে তাঁহাকে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং শ্রীহরি সেই পুরীর দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিলেন। বলি মহারাজ যে চিন্ময়ের ধ্যান প্রত্যহ করিতেন, সিংহাসনে বসিয়া তাহা প্রতিনিয়ত দেখিবার সুযোগ পাইলেন।

শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র

শ্রীমান্ অর্জ্জুন মিশ্র একজন মহাসাধু। ভাগবত ও শ্রীমদ্গীতায় তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তিনি এই দুই গ্রন্থের অনুশীলনেই সস্ত্রীক পুরুষোত্তম ধামে জীবনযাপন করেন। একদা গীতা লিখিতে লিখিতে "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য লইয়া তাঁহার একটু সন্দেহ জন্মিল। তিনি এই কথা দুইটি কাটিয়া অন্য কথা বসাইলেন। ভিক্ষা করিয়া অর্জ্জুন মিশ্রের গ্রাসাচ্ছাদন হয়, পূর্ব্বদিন ঝড়বৃষ্টির জন্য অর্জ্জুন মিশ্র ভিক্ষায় বাহির হইতে পারেন নাই, পরদিন ভিক্ষার জন্য বাহির হইলেন। এদিকে জগন্নাথ বলরাম দুই ভাই ব্রাহ্মণ-বালকরূপে স্কন্ধে প্রসাদের ভার লইয়া অর্জ্জুন মিশ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুই ভাই-ই রোদন করিতেছিলেন এবং দুই ভাইয়েরই স্কন্ধ হইতে অবিশ্রান্তভাবে রুধির-ধারা পড়িতেছিল। অর্জ্জুন মিশ্রের স্ত্রী তাড়াতাড়ি আশ্রমের বাহিরে আসিয়া কহিলেন, এ কি! এ কি! তোমাদের মত নবনীত কোমল বালকের স্কন্ধে তিনি এত বড় বোঝা

চাপাইয়া দিয়াছেন! আর তোমরা কাঁদিতেছ কেন? বালকদ্বয় বলিল, মিশ্রঠাকুর আমাদের দুই ভাইকে বড় মারিয়াছেন। মিশ্র-ঠাকুরাণী কহিলেন, সে কি ঠাকুর ত তেমন লোক নন! তিনি ত কাহাকেও কখন কষ্ট দেন না! বালক দুইটি বলিল, "আমরা মিথ্যা কথা বলিতেছি না; সত্য সত্যই মিশ্রঠাকুর আমাদিগকে বড় মারিয়াছেন! এই দেখনা লোহার কণ্টক দিয়া আমাদের শরীর আঁচড়াইয়া দিয়াছেন।" এই বলিয়া প্রসাদের ভার রাখিয়া বালক দুইটি চলিয়া গেল, মিশ্র-ঠাকুরাণী মনের দুঃখে ও ক্ষোভে ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। অতঃপর অর্জ্জুন মিশ্র ঘরে আসিবামাত্র মিশ্র-ঠাকুরাণী তাঁহাকে একটু ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, লেখাপড়া শিখে—গীতা ভাগবত পড়ে—শেষে কি বালক-নিগ্রহ শিখিয়াছ? আহা! কেমন সুচারু বদন, সুকুমার বালক দু'টি! তুমি কোন্ প্রাণে-লৌহ কণ্টক দিয়া তাহাদের গায়ে আঁচড় দিলে? অর্জ্জুন মিশ্র পত্নীর কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন—বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ? আমি ত তোমার কথার এক বর্ণও বুঝিতেছি না। আমি ত কাহারও অঙ্গে লৌহ-শলাকার খোঁচা মারি নাই! কই, কাহারও স্কন্ধে চাপাইয়া আমি প্রসাদ পাঠাই নাই।" মিশ্র-ঠাকুরাণী বলিলেন, তুমি পাঠাও নাই—তবে কে প্রসাদ পাঠাইয়াছে? কেন আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিতেছ? অর্জ্জুন মিশ্র তখন ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে পড়িল যে, কাল গীতা পাঠকালে তিনি গীতার একটি ছত্র কলমের দ্বারা কাটিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই সেই কলমের খোঁচা আমার জগন্নাথ বলরামের দেহে লাগিয়াছে! ভাবিয়া অর্জ্জুন মিশ্র মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ আমি এতক্ষণে সব বুঝিতে পারিয়াছি। কাল গীতা

পাঠকালে বুঝিতে না পারিয়া "বহাম্যহং" এই ছত্রটি কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম, সেই কলমের খোঁচা নিশ্চয়ই জগন্নাথ বলরাম দুই ভাইয়ের অঙ্গে লাগিয়াছে! অহো! তুমি কি ভাগ্যবতি! আমার ভাগ্যে জগন্নাথ বলরাম সন্দর্শন হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ "বহাম্যহং" "বহাম্যহং" কথা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ হইল অর্জ্জুন মিশ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন—আজিও অর্জ্জুন মিশ্রের গীতার টীকা সর্ব্বজন সমাদৃত ও ভক্তসুধী সমাজকর্ত্তৃক পঠিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ।

পুরাকালে সুবদ্ধি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বাটীতে একটী বিগ্রহ ঠাকুর ছিলেন, ব্রাহ্মণ সেই বিগ্রহের নিত্য পূজার্চ্চনা করিতেন। প্রত্যহ নানা প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের নিকট দিতেন—কত প্রকারে ঠাকুরকে তাহা খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই তাহা খাইতেন না। সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ব্যবহারে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া একদিন অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ঠাকুর আজ আর তোমায় ছাড়িব না, এই অন্ন-ব্যঞ্জন যদি আজ না খাও, তবে এখনই ইহা তোমার সম্মুখে শৃগাল কুক্কুর দ্বারা খাওয়াইব। কিন্তু ঠাকুর তথাচ খাইলেন না দেখিয়া সুবুদ্ধি বলিলেন,

ঠাকুর এখনও তুমি খাইলে না? তুমি এখনও আমার কথা ঠাট্টা বলিয়া মনে করিতেছ? এখনই আমি শিয়াল কুকুর ডাকিয়া এই অন্ন-সম্ভার তাহাদিগকে দিব—তোমাকে ইহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত লইতে দিব না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তুলা আনিয়া দেবতার নাকে পূরিয়া দিলেন। দয়াল ঠাকুর ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া একেবারে খল খল করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই যে আমি খাইতেছি—আর কাহাকেও দিও না।" ঠাকুর এই বলিয়া আপন হাতে ভক্তের প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

রাজা জয়মল।

প্রাচীনকালে জয়মল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে সর্ব্বদা উদাসীন থাকিয়া দেব বিগ্রহ শ্যামল-সুন্দরের পূজার্চ্চনা করিতেন। অন্য এক প্রতিযোগী রাজা জয়মলের এইরূপ বিষয়-ঔদাসীন্য দেখিয়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া তাঁহার রাজধানী অবরোধ করিল। রাজা জয়মল কিন্তু যথারীতি শ্যামল-সুন্দরের পূজা করিতেছেন, তিনি এদিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। রাজমাতা ইহা দেখিয়া নিজে অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "পুত্র, এ তোমার কি ব্যবহার! প্রাসাদের চারি পার্শ্বে শত্রুর সৈন্য সামন্ত অবরোধ করিয়াছে, আর একদিন পরেই সকলকে বিনাশ করিবে, এখনও তুমি যুদ্ধ না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বিগ্রহের পূজাতেই নিমগ্ন রহিয়াছ? জয়মল বলিলেন, মা, আমি কি করিব? যিনি আমাকে রাজ্য দিয়াছেন, যদি তাঁহার

অভিপ্রেত হয়, তবে তিনি তাহা ফিরাইয়া লইবেন। দেবতার আদেশ না হইলে আমি কি কিছু করিতে পারি? রাজমাতা পুত্রের জবাব শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। এদিকে শ্যামল-সুন্দর নিজে এক সিপাহীর বেশ ধারণ করিয়া অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব লইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে শাণিত তরবারির সাহায্যে শত্রুপক্ষের সমস্ত সৈন্য সামন্তকে কাটিয়া ফেলিলেন। কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে মারিলেন না। এদিকে শত্রুসৈন্যের বিনাশ সংবাদ শুনিয়া রাজা জয়মল যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন— তাই ত আমার সৈন্যব্যূহের মধ্যে কে এমন নিপুণ যোদ্ধা যে এত বড় বিরাট শত্রুসৈন্যচয়কে একাকী বিনাশ করিল! ভাবিতে ভাবিতে রাজা জয়মল শ্যামল-সুন্দরের মন্দিরে যাইয়া দেখেন, মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাঁহার অশ্ব দণ্ডায়মান— মুহুর্মুহু তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বহির্গত হইতেছে। তখন জয়মলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা ভগবান শ্যামল-সুন্দরেরই কাণ্ড।

অতঃপর সেই প্রতিযোগী রাজা গললগ্নী-কৃতবাসে, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া জয়মলের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমার আর আপনার রাজ্যজয়ে অভিলাষ নাই, যদি প্রয়োজন হয় আপনি আমার রাজ্য লউন। জয়মল বলিলেন, মহারাজ! কে কার রাজ্য ভোগ করে— কেবা কার রাজ্য অধিকার করে। এ সব লীলাময়ের কাজ, তিনি যা করেন, মানুষ তাহাই করিতে বাধ্য। অতঃপর শ্যামল-সুন্দরকে প্রণাম করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা আপন রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। জয়মল সুখে-শান্তিতে পূর্ব্ববৎ শ্যামল সুন্দরের পূজার্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামদাস সাধু।

দ্বারকার নিকট রামদাস নামে এক সাধু বাস করিতেন। ইনি নিত্য একাদশীর ব্রত করিতেন এবং একনিষ্ঠ চিত্তে "রণ-ছোড়" নামক দেবতার পূজার্চ্চনা করিতেন। ক্রমে রামদাসের বয়স অশীতি বৎসর হইল। রামদাসের বার্দ্ধক্য জরাজীর্ণ দেহ দেখিয়া ঠাকুরের বড় দয়া হইল। তিনি রামদাসকে বলিলেন, দেখ রামদাস! আর তুমি এ রাজপুরীতে থাকিয়া এ ভাবে কষ্ট পাইও না, তুমি বাড়ী যাও, আমি সেইখানেই গিয়া তোমার পূজা গ্রহণ করিব। রামদাস বলিলেন, ঠাকুর আমায় ছলনা কর কেন? তুমি রাজরাজেশ্বরের বাড়ীর কুল-দেবতা, তোমাকে এঁরা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর বলিলেন, আমি যদি যাই তবে এদের সাধ্য কি আমায় ধরিয়া রাখে? ঠাকুর রাত্রিকালে রামদাসকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিলেন। রামদাস গাড়ী লইয়া আসিলে, ঠাকুর গাড়ীর মধ্যে আরোহণ করিলেন! গাড়ী কিছুদূর যাইতে না যাইতে সেবকগণ মন্দিরে আসিয়া দেখে মন্দিরে ঠাকুর নাই, তখন তাহারা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। সেবকগণকে গাড়ীর নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, আমাকে এই সন্নিহিত পুকুরের মধ্যে নিক্ষেপ কর, তুমি নিরাপদ হইবে। রামদাস তাহাই করিলেন। দূর হইতে সেবকেরা তাহা দেখিতে পাইল। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া রামদাসের অঙ্গে শূলের আঘাত করিতে লাগিল এবং তাহার অঙ্গ হইতে দরদর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। পুষ্করিণী হইতে "রণ-ছোড়" বিগ্রহ উঠাইয়া দেখে যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া

রক্তধারা বহিতেছে। তখন সেবকেরা মাথায় করাঘাত করিয়া 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিল। কেন আমরা ভক্তের অঙ্গে এই ভাবে শূলের আঘাত করিলাম! ভক্ত ও ভগবানে যে অভেদ, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ! ভক্তের প্রাণে ব্যথা লাগিলে সে ব্যথা যে ভগবানের প্রাণে গিয়া বাজে তাহা ত এত দিন জানিতাম না! তখন তাহারা রামদাসের পায়ে ধরিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, স্বামিজী, তুমি ঠাকুরকে যথা ইচ্ছা লইয়া যাও, আমরা আর ঠাকুরকে আটকাইব না। ঠাকুর সেবকগণকে বলিলেন, তোমরা আমার বিজয়মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার পূজা কর গিয়া, আমি সেই বিজয়মূর্ত্তির মধ্যেই প্রকট হইব। সেবকগণ ফিরিয়া আসিয়া তাহাই করিল। এদিকে রামদাসও মহোল্লাসে "রণ-ছোড়" বিগ্রহ লইয়া স্বগ্রামে যাইয়া তাহা আপন আলয়ে প্রতিষ্ঠিত করতঃ ভক্তিভরে পূজা করিতে লাগিলেন।

কবীর

কবীর যবনের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে কবীরের প্রাণে বাল্যকাল হইতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। রামচন্দ্র একদা আকাশবাণী করিয়া কবীরকে জানাইলেন যে, রামানন্দ সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর গিয়া, তাহা হইলে তুমি তাঁহার আশ্রমে আমাকে পাইবে। কবীর আকাশ-বাণী শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,

তাই ত আমি যবন, অস্পৃশ্য, স্বামী রামানন্দ কি আমার মুখদর্শন করিবেন? কিন্তু না দেখেন তবুও তাঁহার কাছে আমাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে। গুরু রামানন্দ প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যান—কবীরজী সেই সন্ধান পাইয়া একদিন অতি প্রত্যুষে ঘাটের নীচের সোপানে গিয়া সাষ্টাঙ্গে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখনও দিব্য অন্ধকার রহিয়াছে। গুরু রামানন্দ স্নান করিতে আসিয়া হঠাৎ কবীরের দেহ পায়ে স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন এবং "রাম" "রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীর মনে ভাবিলেন, এই ত আমার দীক্ষা হইয়া গেল। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কবীর গৃহকর্ম্ম জাতি-পাঁতি সমস্ত ছাড়িয়া তিলক-তুলসী-মালা ধারণ করিয়া দিবা-নিশি কেবল সেই নাম জপ করিতে লাগিলেন। কবীরের তদবস্থা দেখিয়া তাঁহার মা রামানন্দের কাছে গিয়া বলিল, ঠাকুর, তুমি আমার ছেলেকে একি শিক্ষা দিয়াছ? সে দিনরাত কেবল রাম নাম জপ করে—গৃহকর্ম্মে আদৌ মন দেয় না। রামানন্দ বলিলেন, সে কি বাপু, আমি ত কবীর নামে কাহাকেও কোন দীক্ষা দিই নাই, কিংবা কবীর বলিয়া আমার কোন শিষ্যও নাই। কবীরের মা গিয়া কবীরকে এই কথা বলিলে, কবীর বলিলেন, মা, তুমি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করিও না। স্বামিজী আমায় সত্যই দীক্ষা দিয়াছেন, তবে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। আচ্ছা, আমি স্বামিজীর কাছে গিয়া তাঁহাকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আসিতেছি। কবীর স্বামিজীর কাছে গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, ঠাকুর, অমুক দিন অমুক সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণকালে আপনি যে আমাকে "রাম" নাম শুনাইয়াছিলেন, আমি তদবধি সেই রাম নাম মহামন্ত্র জপ করিয়া আসিতেছি। রামানন্দ কবীরকে তৎক্ষণাৎ

আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার প্রকৃত ভক্ত শিষ্য! আজ হ'তে আর তুমি যবন নহ,—তুমি আমার অঙ্গের আর একখানি অঙ্গ। এই বলিয়া স্বামিজী তাঁহাকে পুনরায় কণ্ঠি ও তিলকে বিভূষিত করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ঃ—

"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ, যৎ প্রহ্বনাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে, কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে এবং ক্বচিৎ যাঁহাকে বন্দনা ও স্মরণ করিলে, চণ্ডালও সদ্য সোম-যজ্ঞকারী বলিয়া কল্পিত হয়, সেই ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কিরূপ পবিত্র হওয়া যায়, তাহা আর কি বলিব?

শুধু বেদ-বেদান্ত পড়িলেই যে ভগবন্নিষ্ঠ হওয়া যায়, এরূপ নহে! আবার যে বেদ-বেদান্ত না পড়িয়াও ভগবানে অনুরক্ত—সে সাধু—সে মহাপুরুষ—সে বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইতেও শ্রেষ্ঠ।

"অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

অর্থাৎ সমগ্র বেদে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াও, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রার্থবিদ্ হইয়াও, সর্ব্বেশ্বর ভগবানে যিনি ভক্ত নহেন—তিনি পুরুষাধম।

"নাধীত বেদশাস্ত্রোঽপি ন কৃতাধ্বর ইত্যপি।
যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ॥"

বেদশাস্ত্র পাঠ না করিয়াও এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান না করিয়াও, যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহার দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মই সমাহিত হয়।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে বলিতে হইলে, কবীর যবনের ঘরে

জন্মগ্রহণ করিলেও এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলেও তিনি পবিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত এবং পুরুষ শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মহাত্মা কবীর সম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকা আছে। কবীর মায়ের অনুরোধে জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁতে কাপড় বুনিতেন এবং সেই কাপড় হাটে বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা গৃহস্থালীর আহার্য্য-সম্ভার ক্রয় করিতেন। কবীর তাঁতের নলি চালান আর সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে রাম নাম গান করেন। একদিন একখানি কাপড় বুনিয়া লইয়া কবীর হাটের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন ভিখারী আসিয়া তাহা চাহিল। কবীর কাপড়খানা দুই ভাগ করিয়া ছিঁড়িয়া তাহাকে দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ভিখারী বলিল, তাহা হইবে না, আমি গোটা কাপড়খানা চাই। কবীর তৎক্ষণাৎ সেই কাপড়খানা তাহাকে দিয়া এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া রামনাম গান করিতে লাগিলেন। ঘরে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই—রিক্ত হস্তে কোন্ সাহসে কবীর ঘরে ফিরিবেন! মা যে তাহাকে বকিবে! কবীর কোন্ মুখে ঘরে ফিরিবেন? এদিকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কবীরের বেশ ধারণ করিয়া বলদের গাড়ীতে করিয়া চাউল, ডাউল, তরী-তরকারী প্রভৃতি কবীরের গৃহে দিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার একটু পরেই কবীর গিয়া বাটীতে উপস্থিত। ভারে ভারে চাল, ডাল, তরীতরকারী দেখিয়া কবীর ত অবাক্! কবীরের মা বলিল, বাছা, এই যে তুই বলদের গাড়ীতে করিয়া এই সব জিনিসপত্র আনিয়া রাখিয়া গেলি—আবার এখন বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ কেন? কবীর বলিলেন, সে কি আর আমি? যাঁকে দিবানিশি ডাকি তিনিই আজ তোমায় দেখা দিয়া গিয়াছেন, মা তুমি বড় ভাগ্যবতী—মা তুমি বড় ভাগ্যবতী!

কবীর বৈষ্ণবদের ডাকিয়া সেই চাউল—ডাউলে মহোৎসব করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের মহা ঈর্ষার উদ্রেক হইল। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমরা ব্রাহ্মণ—আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কি না বৈষ্ণবগণকে খাওয়ান হইল! কবীর আবার ঘাটে গিয়া ভগবান রামচন্দ্রকে ভক্তিভরে ডাকিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র এবারও কবীরের বেশ ধরিয়া প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী তাঁহার বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। কবীর তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অতি পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন। কিন্তু অসূয়াপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা তত্রাচ তাঁহার প্রতি হিংসা ছাড়িল না। বরং বৈষ্ণবের বেশে গ্রামে গ্রামে যাইয়া ব্রাহ্মণেরা প্রচার করিল যে, কবীর অমুক দিনে বৈষ্ণবদিগকে একটা মহা ভোজ দিবেন, ঐ দিন যেন সমস্ত বৈষ্ণবেরা অবশ্য অবশ্য কবীরের বাটীতে যায়। নির্দ্দিষ্ট দিনে কাতারে কাতারে বৈষ্ণব আসিয়া কবীরের বাটীতে উপস্থিত হইল। কবীর "হা রাম" "হা রাম" বলিতে বলিতে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। এ দিকে কবীর-বেশী ভগবান্ রামচন্দ্র আসিয়া সমাগত সমস্ত বৈষ্ণবগণকে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া কবীরের মান রক্ষা করিলেন। কিন্তু ঈর্ষান্বিত ব্রাহ্মণগণ ইহাতেও নিরস্ত হইল না। তাহারা বাজারে এক বেশ্যাকে ঘুষ দিয়া তাহার দ্বারা প্রচার করাইল যে, কবীর সেই বেশ্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত। ক্রমে সেই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। যাহারা পূর্ব্বে কবীরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত তাহারা আর কবীরকে দেখিলে মাথা নত করে না—আর কবীরকে দেখিয়া বিন্দুমাত্র ভক্তির ভাব দেখায় না। কবীর স্থির করিলেন, ব্রাহ্মণেরা যে বেশ্যার সহিত আসক্ত বলিয়া তাহার নামে দুর্ণাম রটাইয়াছে, সেই বেশ্যাকে তিনি সঙ্গে লইয়া রাজসভাতে

যাইবেন। কবীরের যাহা সংকল্প তাহাই কাজ। বেশ্যাকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা কবীরের সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। কবীর রাজসভা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় করমণ্ডল হইতে জল ঢালিতে ঢালিতে গেলেন। রাজা তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এ লোকটা আমার কোন অমঙ্গলের কল্পনা করিয়া যাইতেছে। এই ভাবিয়া রাজা কবীরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এইভাবে জল ছিটাইতে ছিটাইতে যাইতেছ কেন? কবীর বলিলেন, শ্রীপুরুষোত্তম ধামে আগুন লাগিয়াছিল, সেই আগুন নিভাইবার জন্য আমি কমণ্ডলু হইতে জল নিঃসরণ করিতেছিলাম, কি জানি যদি যাত্রীদের পা পুড়িয়া যায়। রাজা তৎক্ষণাৎ দিন, ক্ষণ, তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া—পুরুষোত্তমে লোক পাঠাইয়া দিয়া জানিলেন যে, কবীর যেদিন, যে সময়ে কমণ্ডলু হইতে জল নিঃসরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পুরুষোত্তধাম শ্রীক্ষেত্রে আগুন লাগিয়াছিল। তখন রাজার মনে ভয় উপস্থিত হইল। যে কবীরকে তিনি ভ্রষ্ট চরিত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই কবীর যে এত বড় মহা-পুরুষ তাহা ভাবিয়া রাজা ও রাণী উভয়ে যুগপৎ শঙ্কান্বিত হইয়া কবীরের বাটীতে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কবীর রাজা ও রাণীকে অভয় দিয়া বলিলেন, আপনারা আমাকে কোনই অবমাননা করেন নাই, আপনারা ঘরে যাইয়া রামচন্দ্রের সেবা করুন, তিনি আপনাদের মঙ্গল বিধান করিবেন।

ব্রাহ্মণগণ এত করিয়াও যখন কবীরকে জব্দ করিতে পারিলেন না, তখন তাহারা মনে মনে এক ফন্দী আঁটিল। তাহারা পাৎসাহের নিকট গিয়া বলিল, কবীর নামে একজন মুসলমান আপন ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম ভজনা করিতেছে এবং নানাপ্রকার গুণজ্ঞান ও

ভোজ-বিদ্যার প্রভাবে অনেক নারীকে কুলের বাহির করিতেছে।' পাৎসাহ তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কবীরকে তলব করিলেন। কবীর পাৎসাহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অমাত্যগণ পাৎসাহকে সেলাম করিতে বলিল। কবীর বলিলেন, একমাত্র রামচন্দ্রই আমার প্রণামের যোগ্য, রামচন্দ্র ছাড়া আমি আর কাহাকেও প্রণাম করি না। ইহা শুনিয়া পাৎসাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নদীর জলে ডুবাইতে আদেশ করিলেন। কবীরের হস্তপদে শৃঙ্খলযুক্ত করিয়া তাঁহাকে নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া হইল, কি আশ্চর্য্য! কবীর নদীতটে আসিয়া দাঁড়াইয়া "রাম" "রাম" বলিতে লাগিলেন। অগ্নির মধ্যে কবীরকে নিক্ষেপ করা হইল, অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া নির্ব্বাপিত হইল। কবীর অক্ষত দেহে বসিয়া যোগাসনে "রাম" "রাম" করিতেছেন। তোপের সম্মুখে কবীরকে দণ্ডায়মান করিয়া তোপ দাগা হইল, গুলি কবীরের দেহ স্পর্শ করিল না। তখন পাৎসাহ কবীরকে সাক্ষাৎ মহাপুরুষ জ্ঞানে বহু স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

/ অতঃপর কবীর পাটনার নিকট একটি রম্য স্থানে আসিয়া দেহ-ত্যাগ করিলেন। হিন্দুমুসলমান উভয় ভক্ত-সম্প্রদায় কবীরের দেহ লইবে বলিয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুটীরের মধ্যে যাইয়া দেখে বস্ত্রাবরণের মধ্যে কবীরের মৃতদেহ নাই—কবীর সশরীরে বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। তখন বৈষ্ণবগণ কবীরের দেহাবরণস্থ তুলসী পত্র লইয়া তাহা সমাধি দিল, মুসলমান ভক্তগণ পুষ্পগুলি লইয়া তাহা কবর দিল। /

শ্রীরুইদাস।

গুরু রামানন্দ স্বামীর একজন ব্রহ্মচারী শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মচারী প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া ভিক্ষা করিয়া যাহা আনে তাহা রাঁধিয়া দেয় আর গুরু রামানন্দ পরম পরিতোষ সহকারে তাহা ভক্ষণ করেন। প্রতিদিন এইভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া এক মহাজন বলিল, ওগো ব্রহ্মচারী ঠাকুর, তুমি এইভাবে রোজ রোজ মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া আন কেন? আমি তোমাকে প্রতিদিন একটি করিয়া সিধা দিব তুমি তদ্দ্বারা স্বামিজীকে খাওয়াইও। ব্রহ্মচারী দুই একদিন তাহাই করিল। স্বামিজী তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মচারীকে অভিশাপ দিলেন, যেমন তুমি ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া ভিক্ষার পরিবর্ত্তে সিধা আনিয়া আমার উদরকে কলুষিত করিয়াছ, সেই জন্য তুমি মুচির ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে। স্বামিজীর বাক্য ব্যর্থ হইল না। দেহান্তরে সেই ব্রহ্মচারী বিপ্র-তনয় এক মুচির ঘরে গিয়া জন্মগ্রহণ করিল। জন্মগ্রহণের পর একে একে তাহার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হইতে লাগিল। রুইদাস প্রতিদিন দুই জোড়া করিয়া জুতা তৈয়ারী করে, এক জোড়া বৈষ্ণবকে দান করে আর একজোড়া বেচিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন করে। আর জুতা বানাইতে বানাইতে সে "রাম নাম" গান করে। অতঃপর লোকালয় হইতে একটু দূরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রুইদাস এক শালগ্রাম শিলা আনিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। রুইদাস এখন আর বড় একটা জুতা তৈয়ারী করে না। কাজেই কোন দিন রুইদাসের অন্ন জুটে, কোন দিন বা

জুটে না। ভক্তবৎসল ভগবান রামচন্দ্র রুইদাসের ক্লেশ দেখিয়া একখানি স্পর্শমণি লইয়া রুইদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। রুইদাস বলিল, তুমি কে, কি জন্য আমার নিকট উপস্থিত? ব্রাহ্মণরূপী ঠাকুর বলিলেন, "আমি যেই হই না কেন—তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে, তুমি আর কষ্ট করিও না। এই স্পর্শমণি লও, ইহা লোহাতে ছোঁয়াইবামাত্র লোহা সোণায় পরিণত হইবে। তখন তুমি যাহা তাহা কিনিয়া খাইতে পারিবে, তোমার আর কষ্ট থাকিবে না।" রুইদাস বলিল, ঠাকুর, তুমি যেই হও, তোমার অভিপ্রায় ভাল। আমি দরিদ্র মুচি, খাটিয়া খাই তাহাতে আমার মনে অর্থের অহঙ্কার আসে না, আর এই স্পর্শমণির সংযোগে লোহাকে সোণা করিলে আমার মনে অযথা অহঙ্কার আসিবে, আমি প্রভুর "রাম" নাম ভুলিয়া যাইব। ঠাকুর বলিলেন, "দেখ তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার মনে কষ্ট হয় বলিয়াই আমি এইরূপ করিতেছি, এই দেখ, তোমার এই চামকাটা লৌহখণ্ডকে আমি সোণা করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই চামকাটা "রাম্পিতে" স্পর্শমণি সংযোগ করিবামাত্র তাহা সোণায় পরিণত হইল। রুইদাস শিরে করাঘাত করিয়া হায়! হায়! করিতে করিতে বলিল, ঠাকুর তুমি এ কি করিলে! এখন আমি কি দিয়া চাম কাটিব! ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি রাখিয়া প্রস্থান করিলেন, রুইদাস তাহা চালের মধ্যে গুজিয়া রাখিল। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণরূপী ঠাকুর আসিয়া রুইদাসকে বলিলেন, রুইদাস তোমার কষ্ট ত আমি আর দেখিতে পারি না, তুমি স্পর্শমণি যখন লইলে না, তখন তোমার বিগ্রহ ঠাকুরের আসনের নীচে পাঁচটি মোহর আছে তাহা লইয়া নিজের অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর কর। রুইদাস তাহাও লইল না। বরং বলিল, ঠাকুর যদি তুমি সত্য সত্য আমার সেই প্রাণারাধ্য

শ্রীরামচন্দ্রই হও, তবে একবার নিজের স্বরূপমূর্ত্তি আমায় দেখাও না কেন, দেখিয়া আমি নয়ন-মন সার্থক করি! ব্রাহ্মণরূপী ঠাকুর তখন পীতাম্বর নবঘন শ্যামল-সুন্দর বেশে রুইদাসকে দর্শন দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। রুইদাস "কোথা যাও" "কোথা যাও" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

ইহার কিছুদিন পরে ঝালী নামে এক রাণী নানাস্থানে দীক্ষা লইবার মত উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে ফিরিয়া উপযুক্ত গুরু না পাইয়া রুইদাসের নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণ রাণীকে জাতিচ্যুত করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। রাণী সকলকে বলিলেন, "দেখ শুধু উপবীত গলায় দিয়া ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করিলে মোক্ষের দ্বার মুক্ত হয় না, এই রুইদাস ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।" এই বলিয়া রাণী ব্রাহ্মণ-ভোজনের বিপুল আয়োজন করিলেন। কাতারে কাতারে ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছেন, তন্মধ্যে যাইয়া রুইদাস বসিলেন। রুই-দাসকে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা একে একে স্থানত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে বসিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যেখানে যাইয়াই বসে, পার্শ্বে দেখে রুইদাস উপবিষ্ট। ব্রাহ্মণগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া রাণী হাসিয়া অস্থির হইলেন। আহারান্তে রুইদাসকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া স্বহস্তে চামর ব্যজন করিলেন। ভক্তের মাহাত্ম্যের নিকট আজ অন্ধ ব্রাহ্মণ্য গর্ব্ব খর্ব্ব হইল।

শ্রীকরেমতি বাঈ

দক্ষিণ ভারতের খড়েল্যা গ্রামে পরশুরাম নামে এক রাজ পুরোহিত বাস করিতেন। করেমতি বাঈ তাঁহারই কন্যা। অল্পবয়সে করেমতির বিবাহ হয়, কিন্তু করেমতির মন কিছুতেই দৈহিক ভোগ সুখের জন্য গঠিত হয় না। শ্বশুরগৃহ হইতে করেমতিকে লইবার জন্য স্বামী আসিয়াছেন, আজ রাত্রি প্রভাত হইলেই করেমতিকে স্বামী-গৃহে যাইয়া স্বামীর ভোগ-লালসা তৃপ্তির জন্য নিজের দেহ বিক্রয় করিতে হইবে। করেমতি কোন্ প্রাণে জানিয়া শুনিয়া স্বামী-গৃহে যাইবে? শৈশবকাল হইতে সে কৃষ্ণকথা শুনিয়াছে—শুনিয়াছে কৃষ্ণই জগতের একমাত্র সার—কৃষ্ণই জগতের পতি। মনে মনে তদবধি কৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে। আজ কোন্ প্রাণে আবার অন্য পতির অঙ্কশায়িনী হইবে? করেমতি স্থির করিল লোকে যাহা বলে বলুক, সে কিছুতেই স্বামী-গৃহে যাইবে না। ক্রমে এক প্রহর, দ্বিপ্রহর, ত্রিপ্রহর রাত্রি অতিবাহিত হইল, চতুপ্রহরও চলিয়া গেল। ঊষার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি প্রাচী-ললাটে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইয়া প্রভাতের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে করেমতি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, তাইত! আর একটু পরেই ত আমাকে অপরের করে কর-বিন্যাস করিয়া যাইতে হইবে। করেমতি যাইবে কি? করেমতি বাড়ীর সমস্ত দ্বার—সমস্ত বাতায়ন—সমস্ত গবাক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল—দেখিল সমস্তই বহির্দ্দিক হইতে বন্ধ। পিতা তাহার মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তাই বোধ হয় সে যাহাতে পলাইতে না পারে সেই জন্য

এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু হায় রে মানব! মন যার কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরের দিকে ধাবমান হইয়াছে, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি তার হৃদয়ের স্রোতকে পাথরের বাঁধ দিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে? তার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা স্রোতের নিকট যে পাথরের বাঁধও বালির বাঁধের মত উড়িয়া যাইবে। করেমতির বেলাও তাই হইল। করেমতি বহির্গমনের কোথাও কোন সুযোগ না পাইয়া উচ্চ প্রাচীরের উপর হইতে "জয় রাধা কৃষ্ণ" বলিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজবর্ত্ম ধরিয়া চলিতে লাগিল। এদিকে সকালে গাত্রোত্থান করিয়া করে-মতিকে ঘরে না দেখিয়া পরশুরাম রাজ-সকাশে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহী গজারোহী সৈন্যগণকে করেমতির সন্ধানে পাঠাইলেন। বিশাল, বিস্তৃত রাজবর্ত্ম—সম্মুখে বালিকা করেমতি বাঈ "হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" বলিয়া প্রাণপণে দৌড়াইতেছে—পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্যগণ যখন করেমতিকে প্রায় ধরিবার উপক্রম করিয়া ফেলিল, তখন করেমতি অনন্যোপায় দেখিয়া লুকাইবার স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। নিকটে একটা মৃত উষ্ট্রের শবদেহ পড়িয়াছিল। চর্ম্ম, মাংস সমস্ত শৃগাল কুকুরে খাইয়া গিয়াছিল, কেবল অস্থিগুলি একটা আবরণের মত পড়িয়াছিল। তন্মধ্য হইতে পূতিগন্ধ নিষ্কাশিত হইতেছিল। করেমতি অনন্যোপায় দেখিয়া সেই উষ্ট্রের মৃতদেহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহিগণ করেমতির আর কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। এদিকে করেমতি উষ্ট্র দেহ হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে হাঁটিয়া বৃন্দাবন-ধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ব্রহ্মকুণ্ড তীরে চোর বনের ভিতর করেমতি নির্বিষ্টচিত্তে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলেন। দর দর ধারায় তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

করেমতির পিতা কন্যার অনুসন্ধান করিতে করিতে বৃন্দাবনে যাইয়া দেখেন যে, করেমতি স্থিরনেত্রে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে মুক্তাধারার ন্যায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। দেখিয়া পরশুরামের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন—আমি কি নির্ব্বোধ! এই কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা এমন কুসুম কোমলতা বালিকাকে আমি সংসারের মোহনিগড়ে বাঁধিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম! তিনি আর যাতনা সংবরণ করিতে না পারিয়া কন্যার পদতলে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ভগবদ্ভক্তির এমনই মহিমা যে, ইহাতে পিতার মাথা পর্য্যন্ত কন্যার পদপ্রান্তে বিনত হইল। পরশুরাম কন্যাকে বাড়ী ফিরিয়া কৃষ্ণনাম করিতে অনুরোধ করিলেন। করেমতি বলিলেন, বাবা আমার মন পড়য়া রহিয়াছে এই বৃন্দাবনে—শুধু দেহ ঘরে লইয়া গিয়া কি করিব? পিতা পরাস্ত মানিয়া দেশে ফিরিয়া রাজার কাছে কন্যার ভগবদ্ভক্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন; রাজা শুনিয়া নিজে তাঁহাকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনে আসিলেন। দেখিলেন নির্ব্বাক, নিস্পন্দভাবে, ধ্যানস্তিমিত-নেত্রে যোগাসনে বসিয়া ভক্তিমতী করেমতি! দেখিয়া রাজা করেমতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছুদূরে করেমতির জন্য একটি পাকা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। করেমতি অবশ্য নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ মৃত্তিকা খুঁড়িতে অনেক প্রাণী হিংসা হইবে, অতএব কুটীর বানাইয়া কাজ নাই। রাজা কিন্তু করেমতির নিষেধবার্ত্তা শুনিলেন না। করেমতি বহুদিন শুধু শাক, ফল, মূল খাইয়া জীবিত ছিলেন। অদ্যাবধি বৃন্দাবন-ধামে করেমতির কুটীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্রৌপদী

মহাভারতে যতগুলি মহীয়সী নারীর চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্রৌপদীর মত ভক্তিমতী নারী আর নাই। হস্তিনাপুর রাজসভা মধ্যে দুর্মতি দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন দ্রৌপদী কোনরূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া "হা কৃষ্ণ" "কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভবভয় হরি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর সহায় হইলেন। দুঃশাসন যতই বস্ত্র টানে, ততই বাড়িতে লাগিল। শেষে বস্ত্র টানিয়া টানিয়া দ্রৌপদীকে যখন দুঃশাসন কোনরূপে বিবস্ত্রা করিতে পারিল না, তখন দুঃশাসন পরাজয় স্বীকার করিল। যতক্ষণ দ্রৌপদী একহাতে বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া অন্য হস্তে "হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেছিলেন, ততক্ষণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই। তারপর যেই দ্রৌপদী দুইহাত তুলিয়া ভগবানে সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন, অমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। ভগবানে এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ না করিলে তিনি কাহারও সহায় হন না—দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ব্যাপারে ভগবান ইহাই প্রকটিত করিলেন। ভগবানকে পাইতে গেলে তাঁহার উপর এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভর আবশ্যক। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

হে মানব! যদি ভগবান্‌কে পাইতে চাও, তবে সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হও।

দ্বিতীয় বাল্মীকিজি

রামায়ণকার প্রথম বাল্মীকির কথা বলিতেছি না—মহাভারতে বর্ণিত সাধু বাল্মীকিজীর কথা বলিতেছি। এই বাল্মীকি জাতিতে মুচি ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন—লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়াছেন—যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কই শঙ্খ যে বাজে না! তখন যুধিষ্ঠির আকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে ধরিয়া বলিলেন, প্রভু! এত আয়োজন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলাম, আমার যজ্ঞ বুঝি পূর্ণ হইল না। শঙ্খ কেন বাজে না প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেখ লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণে যজ্ঞের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছ বটে, কিন্তু একটিও বৈষ্ণব খায় নাই। সেইজন্য শঙ্খ বাজিতেছে না। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন দুই সহোদরকে বৈষ্ণব খুঁজিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। গ্রামের এক প্রান্তে বাল্মীকি রুইদাস বসিয়া কৃষ্ণনাম গান করিতেছিল—আর জুতা সেলাই করিতেছিল। ভীমার্জ্জুনকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া বাল্মীকি অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল সে কি কোন গুরুতর অপকর্ম্ম করিয়াছে, যাহার জন্য ভীমার্জ্জুন দুই ভাই তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে! কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিয়াও কোন প্রকার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। ভীমার্জ্জুন দুই সহোদর অগ্রসর হইয়া রুইদাসকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। রুইদাস বলিলেন, একি! একি! আমি অতি নীচ, হীন, সামান্য ব্যক্তি—আমার পায়ে রাজভ্রাতা তোমরা প্রণাম কর কেন? এই বলিয়া বাল্মীকি দুই ভাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ভীমার্জ্জুন বাল্মীকিকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, ঠাকুর! তুমি জাতিতে

যেই হও—তুমি সাধু—তুমি মহান্ত—তুমি মহাপুরুষ—তোমাকে আজ দয়া করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে পদধূলি দিতে হইবে। সাধু শুনিয়া ত একেবারেই অবাক্! একি কথা! আমি নীচ, অস্পৃশ্য, পামর, আমাকে রাজসভায় যাইতে হইবে—এ কি অসম্ভব আদেশ! ভীম দেখিল, সাধু সহজে আসিবার পাত্র নহেন! তখন ভীম সাধুকে কোলে করিয়া রথে তুলিয়া লইয়া একেবারে রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকির জন্য তোরণ-দ্বারে নানাপ্রকার বাদ্য বাজিতেছিল—পথ ঘাট সমস্ত দধিহরিদ্রায় অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল—নট, নটী, নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচিতেছিল। ভীম রুইদাসকে লইয়া একেবারে রত্নসিংহাসনে স্থাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির স্বহস্তে বাল্মীকির পদ-ধৌত করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দ্রৌপদী নানাপ্রকার শাক-সব্জী, তরী-তরকারী রন্ধন করিয়া বাল্মিকিকে খাইতে দিলেন।' খাইতে দিবার সময় দ্রৌপদীর মনে একটু অহঙ্কার হইল। নীচ জাতি বলিয়া তাহার প্রতি মনে মনে একটু ঘৃণাও আসিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির শঙ্খে ফুৎকার দিলেন—শঙ্খ বাজিল না। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অতিমাত্র ক্ষুব্ধ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, ভগবন্! আপনার কথামত আমি বৈষ্ণব ডাকিয়া খাওয়াইলাম—শঙ্খ তবু বাজিল না কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ দ্রৌপদী বাল্মীকিকে অন্ন-পরিবেশন করিবার সময় একটু ঘৃণার সহিত পরিবেশন করিয়াছে, এই কারণে শঙ্খ বাজিতেছে না।" মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ভৎর্সনা করিয়া সমস্ত প্রকারের ঘৃণা পরিহার করিয়া দেবতা-জ্ঞানে অন্ন পরিবেশনের জন্য আদেশ করিলেন। দ্রৌপদী এবার তাহাই করিলেন। বাল্মীকি এবার পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিলেন। তাঁহার প্রতি গ্রাসে গ্রাসে শঙ্খ বাজিতে লাগিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সফল হইল।

শ্রীময়ূরধ্বজ রাজা

একবার অর্জ্জুনের কিছু ভক্তাভিমান হইয়াছিল। অর্জ্জুন মনে করিতেন, তাঁহার তুল্য শ্রীকৃষ্ণভক্ত বুঝি বা এ জগতে আর কেহ নাই। ভগবান অর্জ্জুনের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য একদিন নিজে এক ব্রাহ্মণের বেশে এবং অর্জ্জুনকে বালকবেশী সাজাইয়া ময়ূরধ্বজ রাজার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ময়ূরধ্বজ তখন শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনা করিতেছিলেন—তিনি ভৃত্য দিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম জানাইয়া রাজসভা কক্ষে যাইয়া বসিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজবাড়ী ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা ময়ূরধ্বজের কর্ণে সে সংবাদ পৌঁছানমাত্র তিনি গললগ্ন বাসে ব্রাহ্মণের পদযুগল ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ! আমি তোমার আতিথেয়তা গ্রহণ করিতে পারি, যদি তুমি আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ কর। রাজা বলিলেন, শীঘ্র বলুন—অনায়াসে বলুন, ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূরণ করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তখন ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমরা পথ দিয়া আসিবার কালে একটী সিংহ আমার এই বালক পুত্রটিকে খাইতে উদ্যত হয়। পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য আমি অনেক স্তব-স্তুতি করায় সিংহ বলিয়াছে যে, যদি আমি আপনার (রাজার) দেহের অর্দ্ধাংশ মাংস কাটিয়া লইয়া সিংহকে দিতে পারি তবেই সে আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিবে—নতুবা নহে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া মহারাজ ময়ূরধ্বজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, ছি! ছি! ঠাকুর। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তুমি এত

ভাবিতেছিলে? এ দেহ যে আমার অনিত্য—আমি এই দেহকে একটা জলবুদ্বুদের মত মনে করি। এই লও—এই যে তোমার সমক্ষে দেহ পাড়িয়া দিলাম—যত ইচ্ছা মাংস কাটিয়া লও।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, দেখুন, শুধু ইহাতেই হইবে না, একদিকে আপনার পুত্র—অন্য দিকে আপনার স্ত্রী—দুই জনে দুই দিকে করাত দিয়া আপনার দেহ হইতে মাংস কাটিবে। রাজা বলিলেন, বেশ কথা, তাহাতেই বা আপত্তি কি! ব্রাহ্মণ-সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য রাজা ময়ূরধ্বজকে যাহা কিছু করিতে বলনা কেন, রাজা ময়ূরধ্বজ তাহাতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। তখন রাজার আজ্ঞায় তাঁহার গৃহিণী ও পুত্র—দুইজনে দুইদিকে করাত দিয়া টানিতে লাগিল। নাসা, ত্বক প্রভৃতি কাটা হইলে ময়ূরধ্বজের চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজা! তুমি কাঁদিতেছ? এই তোমার পরোপকার নিষ্ঠা? রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ! আমি সে জন্য কাঁদিতেছি না। আমার একটি অঙ্গ যে বৃথা গেল। আমি শুধু সেই শোকেতেই কাঁদিতেছি। আহা যদি আমার অপর অঙ্গের ন্যায় এই অর্দ্ধাঙ্গও কাহারও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিত! তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ ধারণ করিয়া রাজাকে স্পর্শ করিবামাত্র রাজা পূর্ব্বের অবয়ব লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাজা! আমি শুধু তোমার ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ করিয়াছিলাম—তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। তোমার ন্যায় অকপট ভক্ত ত্রিজগতে বিরল। রাজা বলিলেন, ভগবন্! আমাকে এই বর দিন, যেন আর কাহাকেও আপনি এরূপ পরীক্ষা না করেন।

অলর্ক।

পুরাকালে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মদালসা। মদালসার ক্রমে ক্রমে চারিটী পুত্র সন্তান হইল। রাণী চারিটী পুত্রকেই সংসারের অসারত্ব ও হরিনামের মাহাত্ম্য শিখাইয়া বনে প্রেরণ করিলেন। মাতার নিকট পরমার্থ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সেই চারি ভাইই বনে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে রাণীর গর্ভে আর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের অন্নপ্রাশন সময়ে রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্রের নাম কি রাখিব? রাণী উত্তর করিলেন, পুত্রের নাম "হরিদাস" রাখ! রাজা রাণীর কথায় চমকিত হইয়া বলিলেন, তুমি চারিটি পুত্রকে ত হরি-দাস করিয়া বনে পাঠাইয়াছ, আহা! না জানি তাহারা বনের মধ্যে কত কষ্টে আছে! আর কেন এ পুত্রটিকে হরিদাস করিবার সংকল্প করিতেছ? তোমায় মিনতি করিতেছি এ পুত্রটিকে আর বনে পাঠাইও না। আমার এ অতুল ঐশ্বর্য্য একে ভোগ করিতে দাও। রাজার কথায় রাণী মনে মনে বড় দুঃখিত হইয়া এ পুত্রটির নাম রাখিলেন "অলর্ক"। অলর্ক অর্থাৎ দুর্ভাগ্য। যে সংসারের মোহ-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায় তাহাকেই অলর্ক বলে। রাণী পুত্রকে সিংহাসনে বসিবার অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন কি করিয়া পুত্রের মন বিষয়-বাসনা হইতে কৃষ্ণপ্রেমের দিকে আকর্ষণ করা যায়! ভাবিয়া ভাবিয়া রাণী "কৃষ্ণ" নাম একটি স্বর্ণপত্রে লিখিয়া তাহা একটী কবচের মধ্যে পুরিয়া অলর্ককে দিয়া বলিলেন, দেখ, বৎস! এই কবচ নিত্য পূজা

করিবে, আর যখনই কোন বিপদে পড়িবে, তখনই এই কবচ খুলিয়া যে নাম ইহাতে পাইবে তাঁহাকে স্তব-স্তুতি করিবে, তাহা হইলে তুমি সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। কালক্রমে রাজা ও রাণী উভয়েই দেহত্যাগ করিলেন। অলর্ক পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিল। এদিকে বনবাসী তপস্বী চারি ভাই অলর্কের ভোগ-বিলাসের কথা শুনিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় ভাবিতে লাগিলেন। হায়! হায়! আমাদের প্রাণের ভাই কি না শেষে ভোগ-বিলাসে—রাজপ্রাসাদে জীবন যাপন করিতে লাগিল! শেষে চারি ভাইয়ে যুক্তি করিয়া, রাজকুমারের বেশ পরিধান করিয়া অন্য এক প্রতিযোগী রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, দেখুন আমরা অমুক রাজ্যের রাজকুমার—আমাদের চারি ভাইকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আমাদের কনিষ্ঠ ভাই সিংহাসনে বসিয়াছে। আপনি আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই চারি রাজকুমারের সহিত অসংখ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। প্রতিপক্ষের সেই বিরাট সৈন্যবাহিনী দেখিয়া রাজা অলর্ক আপদ বুঝিয়া মাতৃদত্ত সেই কবচটি খুলিলেন। দেখিলেন সেই কবচের মধ্যে স্বর্ণপত্রে "কৃষ্ণ" নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অলর্ক তাহা মাথায় রাখিয়া ভাবিলেন, এইত মহামূল্য ধন আমার! মা আমাকে এই ধন দিয়া গিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা জগতে শ্রেষ্ঠতর ধন আর কি আছে? আমি এতদিন এই ধনে বঞ্চিত হইয়া সংসার-কারায় আবদ্ধ ছিলাম—ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার রাজৈশ্বর্য্যে! এই বলিয়া অলর্ক তৎক্ষণাৎ রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া বনে চলিয়া গেলেন। তখন তাহার চারিভাই প্রতিপক্ষ রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা আমাদের ভাইকে রাজ্যচ্যুত

করিয়া তাহার রাজ্য ভোগ-দখল করিবার জন্য এই যুদ্ধ করি নাই— তাহার মনে একটা বিবেক-বৈরাগ্য জন্মানই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন বিজিত রাজ্য আপনি ভোগ করুন। আমরা বনের সন্তান বনে গিয়া যোগ-তপঃ যেমন করিতে-ছিলাম তেমন করি। এই বলিয়া চারি রাজকুমার বনে গিয়া অলর্কের সঙ্গে "কৃষ্ণনাম" ভজন করিতে লাগিল।

শ্রীনামদেবজী

বামদেব নামে এক সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি ছিপির কার্য্য করিয়া দিনগুজরান করিতেন। তাঁহার এক বিধবা কন্যা ছিল। বিধবা বিগ্রহের পূজার্চ্চনায় বামদেবের সহায়তা করিতেন। তাঁহার সেবার্চ্চনায় বিগ্রহ ঠাকুর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। বিধবার বড় ইচ্ছা তাহার একটি পুত্র-সন্তান হয়। সে বিগ্রহের নিকট একটি পুত্র-সন্তান প্রর্থনা করিল। কালক্রমে বিধবার গর্ভ-সঞ্চার হইল এবং দশ মাস দশ দিন পরে একটি সুন্দর সুঠাম পুত্র-সন্তান প্রসূত হইল। বামদেব লোক-লজ্জায় একেবারে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। রাত্রি-কালে বামদেব স্বপ্নযোগে দেখিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "তোমার কন্যা দুশ্চরিত্রা নহে, বিনা পুরুষের সহবাসে তোমার এই কন্যার গর্ভে আমার বরে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" দেবতার আদেশে বামদেব

আশ্বস্ত হইলেন এবং পুত্রটিকে মহাযত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রটির নাম হইল "নামদেব"। অন্যান্য বালকেরা খেলা-ধূলা করিয়া বেড়ায়—নামদেব কিন্তু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলিয়া বেড়ায়। বাল্যকাল হইতে ভগবানে এই প্রকার মতি-গতি দেখিয়া বামদেব মহা আনন্দিত হইলেন। একদিন বামদেব কোন কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে গেলে নামদেব সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ লইয়া ঠাকুরের নিকট "বৈকালী" দিতে গেল। ঠাকুরের মুখের নিকট দুধের পাত্র ধরিয়া নামদেব বলিল, ঠাকুর এই লও—দুধ খাও। কি! ওরূপ মৃদু মৃদু হাসিতেছ কেন? ওঃ! বুঝিয়াছি আমি সম্মুখে থাকিতে তুমি দুধ খাইবে না। আচ্ছা আমি এই বাহিরে যাইতেছি!"—এই বলিয়া নামদেব বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল, এইবার বুঝি ঠাকুর খাইতেছে, কিন্তু কই? যেমন ঠাকুর তেমনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! নামদেব ঘরে যাইয়া এক-খানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা হাতে লইয়া তাহা নিজের বুকের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, ঠাকুর এইবার খাও ত খাও—নতুবা এখনই তোমার সামনে আমি বুকে ছুরি বসাইয়া মরিব। এই বলিয়া নামদেব যেই ছুরি বসাইতে উদ্যোগী হইল, অমনি ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র উঠাইয়া লইয়া তাহা মুখে ধরিয়া চুমুক দিয়া পান করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিন এইভাবে কাটিল—ঠাকুর প্রত্যহই নামদেবের অর্পিত দুধ পান করিয়া একটু প্রসাদ স্বরূপে রাখেন। বামদেব বাটীতে আসিয়া পৌঁছিতেই নামদেব তাঁহাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিয়া বলিলেন, ঠাকুর সবটুকু খায় না, তোমার জন্য দাদা প্রসাদ রাখিয়া দেয়! বামদেব ত শুনিয়াই অবাক্! শিশু বলে কি! ঠাকুর কি কখন নিজের হাতে দুধের বাটী ধরিয়া চুমুক মারেন! আচ্ছা, তুই আমাকে দেখাতে পারিস্—কেমন ঠাকুর নিজের হাতে দুধের বাটি তুলিয়া খায়! নামদেব বলিল, হাঁ নিশ্চয়ই পারি! চল দুধের বাটী লইয়া ঠাকুর

ঘরে চল, দেখিবে ঠাকুর কেমন নিজের হাতে দুধের বাটী লইয়া চাপ্ চুপ্ করিয়া খায়! নামদেবের সঙ্গে বামদেব মন্দিরে গেলেন, দেখিলেন সত্যে সত্যেই ঠাকুর নামদেবের হাত হইতে দুধের বাটী লইয়া দুধ খাইতেছেন! দেখিয়া বামদেব দৌহিত্রের পদতলে পড়িয়া বলিলেন, নামদেব রে! তুই অতি ভাগ্যবান্!

নামদেবের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা ক্রমে বাদশাহের কর্ণ-গোচর হইল। বিধর্ম্মী বাদশাহ নামদেবকে ধরিয়া লইয়া বলিলেন, দেখ তোমার সমস্ত বুজ্রুকি আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এ সব বুজ্রুকি করিয়া আমার রাজ্যে কেহ বাস করিতে পারিবে না। আচ্ছা, দেখি তুমি কেমন সাধু! যদি এই মৃত বাছুরটিকে বাঁচাইতে পার তবে তোমাকে ক্ষমা করিব, নতুবা তোমাকে কারাগারে পুরিয়া রাখিব। নামদেব তিন বার তুড়ি দিবা মাত্রই বাছুরটি "হাম্বা" "হাম্বা" করিয়া ডাকিয়া তাহার মায়ের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া পীযূষ-পূরিত স্তন্য পান করিতে লাগিল। বাদশাহ তাহা দেখিয়া নামদেবের সাধুত্বে আর সন্দিহান হইলেন না। তিনি বহু টাকা কড়ি আর তৈজসপত্র দিয়া নামদেবকে বিদায় দিলেন। নামদেব কিছু দূর আসিয়া এক নদী দেখিয়া সেই নদীর মধ্যে সেগুলিকে নিক্ষেপ করিলেন। বাদশাহের কয়েকজন ভৃত্য নামদেবের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। তাহারা বাদশাহের নিকট গিয়া বলিল, জাঁহাপনা, সাধুকে যে সমস্ত বহুমূল্য তৈজসপত্রাদি দান করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তিনি নদীর জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। বাদশাহ তাহা শুনিয়া নামদেবকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, সাধু আমি এত যত্ন করিয়া তোমাকে এত টাকা-কড়ি তৈজসপত্র দিলাম, আর তুমি সেগুলি সটান নদীতে ফেলিয়া দিলে! নামদেব বলিলেন, আমি সাধু সন্ন্যাসী ফকির মানুষ, আমি টাকা-কড়ি তৈজসপত্র লইয়া কি করিব? আপনার যদি

দরকার হয় তবে সেগুলি এখনই তুলিয়া দিতে পারি। এই বলিয়া নামদেব নদীতীরে যাইয়া তুড়ি দিবা মাত্র সেই টাকা-কড়ি তৈজসপত্র শয্যাদি সমস্ত শুষ্ক অবস্থায় তীরে আসিয়া উঠিল—নামদেব সে সমস্ত বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

নামদেবের গ্রামে এক বণিক্ তুলা-দানের ব্রত উদ্‌যাপনকালে স্থির করিল যে, সে নামদেবকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তত্তুল্য স্বর্ণ নামদেবকে প্রদান করিবে। তদনুসারে সে নামদেবকে নিমন্ত্রণ করিল। নামদেব প্রথমে কিছুতেই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে রাজী হইলেন না; তারপর অনেক পীড়াপীড়িতে বলিলেন, আচ্ছা দুটি তুলসী পাতা পরিমাণ যে সোণা তাহাই আমাকে দান করিবে। নামদেবের কথা শুনিয়া বণিক্ বলিল, ঠাকুর দু'টি তুলসী পাতার পরিমাণ সোণা আর কত হইবে?—বড় জোর দুই রতি কি তিন রতি। নামদেব বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, উহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। অনন্তর যজ্ঞের দিন বণিক্ তুলাদণ্ডের এক পার্শ্বে দুইটি তুলসীপত্র এবং অন্য পার্শ্বে দুই রতি সোণা বসাইয়া দাড়ীপাল্লা উঁচু করিয়া ধরিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুলসীপত্র তবুও যে ভারে বেশী! ক্রমে দুই চারি রতি করিয়া গৃহে যত সোণা ছিল—এমন কি স্ত্রীলোকদের গায়ের সোণার অলঙ্কার পর্য্যন্ত আনিয়া তুলাদণ্ডে বসাইল—কিন্তু তবুও সোণা তুলসীপত্রের ওজনের সমান হইল না। তখন বণিক্ নামদেবের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঠাকুর, আর কেন আমার সহিত ছলনা! নামদেব বলিলেন, বণিক্! এইবার ত বুঝিলে সহস্র সহস্র মণ সোণা একটি তুলসীপত্রের কাছে কিছুই নহে, অতএব এই সব তুলা-দান ছাড়িয়া তুলসী-মালা লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনা আরম্ভ কর, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে। তদবধি বণিক্ বাহ্যিক যাগ-যজ্ঞ ছাড়িয়া ভক্ত বৈষ্ণব হইল।

একদিন নামদেব রঙ্গনাথ ঠাকুরের মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়াছেন। মন্দিরে অত্যন্ত লোকের ভিড় দেখিয়া তিনি জুতা-জোড়াটি কোমরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মন্দিরের পূজারি ব্রাহ্মণগণ তাহা দেখিয়া নামদেবকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল। নামদেব বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া এক মনে এক প্রাণে গান ধরিয়া দিলেন। রঙ্গনাথ ঠাকুর ভক্তের গান শুনিবার জন্য মন্দিরসহ সেই দিকে ফিরিলেন। কতদিন হইয়া গিয়াছে—আজিও সেই মন্দির তেমনি ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

একদিন একাদশীর দিবসে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি নামদেবকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া নামদেবকে বলিলেন, আমি আজ সারাদিন উপবাসী আছি। আমাকে এখনই অন্ন খাইতে দাও"। নামদেব বলিলেন, ঠাকুর আজ একাদশী—একাদশীর দিন আমি তোমাকে অন্ন দিব কি করিয়া? আজ আমার বাড়ীতে থাক—কাল তোমাকে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাওয়াইব। নামদেবের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, না হে সাধু তাহা হইবে না, আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত—এই মুহূর্ত্তে যদি আমাকে অন্ন ব্যঞ্জন না দাও তবে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।" নামদেব বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইবে না ঠাকুর, আমি একাদশী ব্রত লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্ন-ব্যঞ্জন দিতে পারিব না।" নামদেবের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষুৎপিপাসায় অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। নামদেব ব্রাহ্মণের সংকারের জন্য চিতা-শয্যা প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং শবদেহের এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন। তখন শবদেহ অকস্মাৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নামদেবকে বলিলেন, দেখ নামদেব আমি মরি নাই, একাদশীর প্রতি তোমার

কিরূপ নিষ্ঠা তাহাই দেখিবার জন্য আমি ব্রাহ্মণবেশে তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। নামদেব তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া তৎপরদিন নানা উপচারে তাঁহার অতিথি-সৎকার করিলেন। নাম-দেবের সম্বন্ধে এইরূপ আরও নানা আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। সে সমস্ত সবিস্তারে বর্ণন করিতে গেলে একখানি বৃহদাকার পুস্তক হয়; কাজেই এখানে সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিলাম।

শ্রীসধনা।

সধনা জাতিতে কসাই। সে মাংস কিনিয়া আনিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া কোনরূপে দিনগুজরান করে। এক শালগ্রাম শিলা দ্বারা সে বাটখারার কাজ সম্পন্ন করে। পথের ধারে তাহার দোকান। হঠাৎ একদিন এক বৈষ্ণব সেই পথ দিয়া যাইবার সময় শালগ্রাম-শিলার এ হেন দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় ব্যথিতমনে সেখানে দাঁড়াইল। বৈষ্ণব সধনাকে বলিল, সধনা! এই বাটখারাটা তুমি আমাকে দাও,* আমি তোমায় অন্য একটি বাটখারা দিতেছি। তাহা শুনিয়া সধনা বলিল, তাহা কি হয়? এই বাটখারার এমন গুণ যে, আমি সের, পোয়া, মণ যাহা কিছু মাপিতে চাই না কেন এই এক বাটখারাতে আমার সে কার্য্য সিদ্ধ হয়। অবশেষে বৈষ্ণবের অনেক পীড়াপীড়িতে সধনা সেই বাটখারা বৈষ্ণবকে দিল। বৈষ্ণব তাহা লইয়া নিজের ঘরে স্থাপন করিয়া তুলসী চন্দন দিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল। রাত্রিকালে বৈষ্ণবকে শালগ্রাম-শিলা

স্বপ্নযোগে বলিলেন, "তুই আমাকে এখানে আনিলি কেন? আমি সধনার নিকট বেশ সুখে ছিলাম, সে আমাকে বাটখারারূপে ব্যবহার করিত সত্য, কিন্তু সে যে আমার নাম গান করিত, তাহাতেই আমি তৃপ্তিলাভ করিতাম।" বৈষ্ণব অগত্যা প্রাতঃকালে শালগ্রাম-শিলা লইয়া সধনার নিকট গিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন। সধনা সেই শালগ্রাম-শিলা লইয়া এক স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজার্চ্চনা আরম্ভ করিল। মাংস বিক্রী সে একেবারে ছাড়িয়া দিল। কিছুদিন পরে সধনার মনে পুরুষোত্তমে যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইল। সধনা প্রথমে বহু সঙ্গী পাইল বটে, কিন্তু কসাই বলিয়া একে একে সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। অতঃপর ভিক্ষা করিতে করিতে সধনা একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল, সেই গ্রামে এক কলুবধূ সধনার রূপে বিমোহিত হইয়া ভিক্ষা দিবার ছলে তাহাকে আপন ঘরের মধ্যে লইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল এবং নিজের কু-মতলব তাহার নিকট প্রকাশ করিল। সধনা বলিল, আমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী—আমাকে কেন তুমি এই পাপের পথে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছ? স্ত্রীলোকটি বলিল, তা কিছুতেই হইবে না। আমি তোমাকে দেখিয়া মজিয়াছি! আমাকে তোমার অঙ্কশায়িনী করিতেই হইবে। তোমাকে আমি কত ভালবাসি—তাহা যদি বিশ্বাস না কর, তবে এই দেখ এই মুহূর্ত্তে আমি আমার স্বামীর মুণ্ড কাটিয়া আনিয়া তোমায় উপহার দিতেছি।—এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে যাইয়া তাহার নিদ্রিত স্বামীর মুণ্ড কাটিয়া আনিয়া সধনার সমক্ষে ধরিল। সধনা অনর্থক জীব-হিংসা দেখিয়া থর-থর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু তথাপিও সধনা স্ত্রীলোকটির আশা পূর্ণ করিল না। তখন স্ত্রীলোকটি সধনাকে জব্দ করিবার জন্য চীৎকার করিয়া লোক সংগ্রহ করিল এবং লোকজন সংগৃহীত হইলে তাহাদিগকে বলিল, এই

লোকটা আমাদের বাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়া আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ আসিয়া সধনাকে গ্রেপ্তার করিল। সধনা স্ত্রীলোকটিকে রক্ষা করিবার জন্য হাকিমের কাছে নিজেকে ঘাতক বলিয়া বর্ণনা করিল—তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এদিকে স্ত্রীলোকটি গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, দেখিলে আমি নিজের হাতে স্বামীর শিরচ্ছেদ করিয়া কেমন কৌশলে অন্য লোককে ধরাইয়া দিলাম! এই কথা কাজীর কর্ণে পৌছিল। কাজী সধনাকে নির্দ্দোষী জানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা।

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবি ভিরীড়িতং কল্মষা পহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদা ততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

শ্রীগোপ গীতা।

কৃষ্ণ-কথা সন্তপ্ত জীবনে সুধা বর্ষণ করে। তত্ত্বদর্শী কবিবৃন্দ উহাকে পাপনাশকারী বলিয়া বর্ণন করেন। উহা শ্রবণ মঙ্গলময় ও শান্তি-দায়ক। এই পৃথিবীতে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভূরিদা—অর্থাৎ ভূরি পরিমাণে অমৃত দাতা।

রাজা প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমের অধিকারী। ভগবান্ চৈতন্যদেব যখন পুরুষোত্তমে যান, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে দর্শন করিবার

জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য পাগলের মত হইয়া প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, বিষয়ী জমিদার, রাজা, মহারাজার সহিত আমার দেখা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। রাজা প্রতাপরুদ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন, আমি এ জীবন আর রাখিব না। প্রভু যদি আমাকে দর্শন না দিলেন, তবে আমি এখনই আত্মহত্যা করিয়া মরিব। রায় রামানন্দ যাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্কল্প ভগবান্ চৈতন্যদেবের নিকট জানাইলেন। ভগবান্ চৈতন্যদেব তখনও বাহ্য কোপ দেখাইয়া বলিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র মহা বিষয়ী লোক, তাহাকে কিছুতেই আমি আলিঙ্গন করিতে পারি না। অতঃপর রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ স্থির করিলেন, প্রভু যে সময় কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইবেন, সেই সময় রাজা যেন শ্রীশ্রীরাস পঞ্চ-অধ্যায়ের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হন, তাহা হইলেই প্রভু রাজাকে বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিবেন। এদিকে রাজা প্রভুর সেই ভাবাবেশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। রথ-যাত্রার দিন প্রভু রথের অগ্রে নাচিতে নাচিতে ভাবাবেশে বাগিচায় প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রতাপ-রুদ্র তখন গিয়া প্রভুর সমক্ষে রাস-পঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, প্রভু তাহা শুনিবামাত্র রাজাকে আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তদবধি রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের মহা অনুরক্ত শিষ্য হইলেন।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী।

কাশীধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বাস। তিনি বেদান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং দেববিগ্রহের পূজাদি সগুণ উপাসনা মানেন না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া প্রেম-ভক্তির দ্বারা লোককে উন্মাদিত করিতেছিলেন, সেই সময় প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর উপর চটিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়া প্রভুর নিকট পাঠাইলেন :—

"যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা" মলসরঃ স্বদীর্ঘিকা দীর্ঘিকা,
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভৃত্যে শম্ভুঃ স্বরং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুত ধামনি স্মররিপো নির্ব্বাণ মার্গে স্থিতে ;
মূঢ়েঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয় ধাবতি ইতি।"

অর্থাৎ যেখানে মণিকর্ণিকা, অমল সরোবর প্রভৃতি পুণ্যতোয়া দীর্ঘিকা এবং স্বদীর্ঘিকা, শোভমান; যেখানে শম্ভু স্বয়ং জীবগণকে "তারক"—এই দুর্লভ অক্ষর রত্ন দান করিতেছেন এবং যে স্থান মদনের ক্রীড়া ভূমি নহে, মূর্খেরাই স্মররিপুর মুক্তিপথস্বরূপ এরূপ অদ্ভুত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুবৎ প্রত্যাশায় মোহিনীমূর্ত্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া মরীচিকা লোভে অন্যত্র ধাবিত হয়।

শ্লোক পড়িয়া প্রভু একটু হাসিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন।

"ঘর্ম্মাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী
কাশীনাং পতিরর্দ্ধমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ম্॥
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণ পদাম্বুজং ভজ সখে! শ্রীপাদ নির্ব্বাণ দম্॥

অর্থাৎ যাঁহার ঘর্ম্মজল হইতে মণিকর্ণিকার উদ্ভব এবং যাঁহার চরণকমল হইতে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর জন্ম ; শম্ভু অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া যাঁহাকে ভজনা করেন এবং শিব পরে যাঁহার তারক-ব্রহ্ম নাম—জীবগণের নিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত আছে, হে সখে শ্রীপদে ! তুমি সেই মোক্ষদায়ী শ্রীকৃষ্ণ চরণ-কমল ভজন কর।

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাইয়া আর একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়া দেন :—

"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা
স্তেহপি স্ত্রীমুখ পঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ ॥
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহে যদি ভবেদ্ বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরম্ ॥

অর্থাৎ পরাশর, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ বায়ু, জল, বৃক্ষ পর্ণ মাত্র ভক্ষণ করিয়াও স্ত্রীগণের যে কমনীয় কান্তি মুখপদ্ম দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, দধি-ঘৃত-শাকান্ন-ভোজী—মানবের যদি তদ্দর্শনে মোহাচ্ছন্ন হওয়া অসম্ভব হয়, তবে বিন্ধ্যপর্ব্বতেরও সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।

প্রভুর ভক্তবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞাতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন :—

সিংহো বলী দ্বিরদ শূকরস মাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্ ॥
পারাবতঃ খলু শিলা কণামাত্র ভোগী
কামী ভবেঞ্চ নু দিনং বদ কোহত্র হেতুঃ ॥

সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং হস্তী ও শূকরের মাংস ভোজন করিয়াও সংবৎসরে কেবলমাত্র একমাত্র মাত্র ইন্দ্রিয় সুখে রত হয়। কিন্তু শিলা

খণ্ড ভোজী পারাবত নিরন্তর রতিক্রিয়ার রত থাকে, ইহার কারণ কি বল দেখি ?

এই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রকাশানন্দের মনের গতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইল। তারপর প্রভু চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাইবার কালে কাশীধামে দুই মাস কাল থাকিয়া প্রকাশানন্দের মায়াবশের ভ্রম নষ্ট করিয়া তাঁহাকে মহা কৃষ্ণভক্ত করিয়া তুলিলেন। প্রকাশানন্দ সশিষ্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীতুলসী দাস

সাধু তুলসীদাসের নাম ভক্ত-জগতে অজ্ঞাত ও অবিদিত নহে। তুলসীদাস বড় স্ত্রৈণ ছিলেন। একদণ্ড স্ত্রীর মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। তুলসীর শ্বশুর বহু সাধ্যসাধনা করিয়া একদিনের জন্য তাঁহার কন্যাকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন। তুলসী স্ত্রীর শিবিকার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিল, স্বামিন্! এই রক্ত-মাংসের দেহ-পিণ্ডের উপর তোমার যে মোহ, তাহার শতাংশের একাংশও যদি ভগবানের প্রতি ন্যস্ত করিতে পারিতে, তবে তোমার জীবন সার্থক হইত। স্ত্রীর কথায় তুলসীর বিবেকের উদয় হইল, তুলসী আর ঘরে না ফিরিয়া একেবারে কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তুলসী তথায় এক বৃক্ষতলে বসিয়া পদধৌত করিতেছেন; সেই গাছে একটা ভূত বাস করিত, সেই পদধৌত জলের একবিন্দু তাহার গায়ে লাগায় সে উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিল। তুলসীদাস জিজ্ঞাসা

করিলেন, তুমি কে হে বাপু? এ গাছে ভূত হইয়াছিলে কেন? ভূত বলিল, আমি একজন শাপভ্রষ্ট বৈকুণ্ঠবাসী, এ গাছে শাপভ্রষ্ট হইয়া ভূতবেশে ছিলাম, এখন সাধুর চরণামৃত স্পর্শে মুক্ত হইয়া গেলাম। তুলসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা শ্রীরামচন্দ্রকে পাইবার উপায় কি আমায় বলিতে পার? ভূত বলিল, এই কাশীধামের অনতিদূরে একটি গ্রামে অমুক ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রতিদিন রামায়ণ গান হয়, হনুমান অবধূত বেশে সেখানে প্রতিদিন গান শুনিতে আসেন। তাঁহার দুই পা ধরিয়া কাঁদিবে, তিনি তোমাকে ভগবান রামচন্দ্রকে প্রাপ্তির সন্ধান বলিয়া দিবেন। এই বলিয়া ভূত বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন। ভূতের নির্দ্দেশানুসারে তুলসীদাস ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া রামায়ণ শুনিতে লাগিলেন। প্রত্যহ অবধূতের সহিত তাঁহার চোখা-চোখি হইতে লাগিল। একদিন রামায়ণ গান অন্তে সমস্ত লোক চলিয়া গেলে তুলসী পথিমধ্যে অবধূতকে পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। অবধূত আপন স্বরূপমূর্ত্তি দেখাইয়া তুলসীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অচিরাৎ তাহার ভাগ্যে রামচন্দ্র দর্শন মিলিবে। অবধূতের কথা সত্য হইল—শ্রীরামচন্দ্র তুলসীকে দর্শন দিলেন। রামচন্দ্রের প্রভাবে তদবধি তুলসীর ঐশী শক্তি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। কত অন্ধ তুলসীর কৃপায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল, কত বধির তুলসীর দয়ায় শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইল। একদিন একজন সতীকে স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে দেখিয়া তুলসী বলিলেন, দেখ, এইভাবে দেহকে বিনষ্ট করিলে স্বর্গলাভ হয় না, পরার্থপর তারক-ব্রহ্ম যে নাম সেই নাম সার কর, তবেই মোক্ষ হইবে।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ॥

শ্রীহরির নাম চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত বা নাম নামী অভিন্ন।

স্বর্গার্থী হইয়া নানা কর্ম্ম যেই করে।
দীনহীন সেইজন ভ্রময়ে সংসারে॥
মুমুক্ষু যে জ্ঞানযোগ করয়ে আস্থান।
ক্লেশমাত্র তার যে হারায় প্রেম ধন॥
এক নামে কোটী মহা পাতক নাশিয়া।
জীবন মুকত হয় নির্ম্মল হইয়া॥"

তুলসীদাসের কথা শুনিয়া সতী সহমরণের সংকল্প পরিত্যাগ করিল। এদিকে সতীর স্বামীর শবদেহের কর্ণে "রাম নাম" উচ্চারণ করিবামাত্র তাহার স্বামী জীবিত হইয়া উঠিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তুলসীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

এই সংবাদ সম্রাট আকবরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি তুলসীকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ তুমি নাকি যাদুবিদ্যা জান এবং যাদুবিদ্যার বলে একজন মৃত লোককে বাঁচাইয়াছ, আমার সমক্ষে তোমাকে কিছু যাদুবিদ্যা দেখাইতে হইবে। তুলসীদাস বলিলেন, আমি কোন যাদুবিদ্যা জানিনা, আমি সামান্য একজন ভিক্ষুকমাত্র। ইহাতে বাদশাহ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। অমনি কোথা হইতে পালে পালে হনূমান আসিয়া বাদশাহের বাড়ী চুরমার করিতে লাগিল। বাদশাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া বহু স্তব-স্তুতি করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। তুলসী হৃষ্টচিত্তে বাদশাহকে ক্ষমা করিলেন।

মহারাজ-হংসপ্রসঙ্গ।

এক রাজার দেহে কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। বৈদ্যকে আহ্বান করিলে বৈদ্য বলিল, মানস-সরোবর হইতে রাজহংস ধরিয়া আনিয়া তাহার পিত্তের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে রাজার ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। রাজার আদেশানুসারে তখনই ব্যাধসকলকে মানস-সরোবরে রাজহংস ধরিবার জন্য পাঠান হইল। ব্যাধগণকে দেখিয়াই হংস-গণ উড়িয়া চলিয়া গেল। তখন ব্যাধেরা এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা গৈরিক বসন, কৃত্রিম জটা, কমণ্ডলু, তিলক, তুলসীর মালা ধারণ করিয়া সরোবরে গেল। এবার তাহাদিগকে দেখিয়া একটি হংসও উড়িল না। ব্যাধেরা হংস ধরিয়া রাজসকাশে লইয়া আসিল। রাজা ব্যাধেদের মুখে হংস ধৃত করিবার কৌশল শুনিয়া—মনে মনে ভাবিলেন, এই হংসেরা এমন সরল যে, সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে একটুও ভয় করে না। ইহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া ধৃত করা কোন মতে উচিত হয় নাই। এই ভাবিয়া রাজা হংসগুলিকে—ছাড়িয়া দিলেন। অন্য এক বৈদ্যের চিকিৎসায় তিনি নিরাময় হইলেন, এদিকে ব্যাধগণও অহিংসার মাহাত্ম্য দেখিতে পাইয়া ভাবিল, যদি কপট সাধু সাজিলে বনের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত এত বিশ্বাস করে, তবে না জানি খাঁটি সন্ন্যাসী হইলে সকলে আমাদিগকে কত বিশ্বাস করিবে! এই ভাবিয়া ব্যাধেরা তদবধি পক্ষি-শীকার ছাড়িয়া দিল, এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া তদবধি কৃষ্ণনাম জপ তপ করিতে লাগিল।

শ্রীমৌনী রাজপুত্র।

এক রাজপুত্র জন্মাবধি কথাবার্ত্তা না বলায় রাজার মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল। একে রাজার ঐ একটি মাত্র পুত্র, কত সাধ্য সাধনা, কত পূজার্চ্চনা করিয়া ঐ একটি মাত্র পুত্র হইয়াছে, তাহাতে পুত্র বোবা হইল। রাজা পুত্রের মৌনভাবে যৎপরোনাস্তি ব্যথিতভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে কথাবার্ত্তা বলাইবার নানারূপ চেষ্টা করিয়া যখন রাজা কোনপ্রকারেই পুত্রের বাক্‌স্ফূর্ত্তি করাইতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি বহু সৈন্য-সামন্ত দিয়া রাজপুত্রকে বনে মৃগয়া করিবার জন্য পাঠাইলেন। মৃগয়ায় গেলে একজন সৈনিক একটি গর্ভবতী হরিণীর উপর বাণ ছুড়িয়া মারিয়া ফেলিল। হরিণীর গর্ভ হইতে একটি সদ্যজাত শাবকও বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ ছটফট্ করিয়া মারা গেল। রাজকুমার তাহা দেখিয়া বলিলেন, "আহা হা, করিলে কি, বিনাদোষে এই হরিণী ও হরিণ শিশুটীকে মারিয়া ফেলিলে?" রাজকুমারের কথা শুনিয়া সৈনিক একটু হাসিয়া রাজার নিকট আসিয়া এই সংবাদ দিল। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রকে কথা বলিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; রাজকুমার কথা বলিলেন না। তখন সৈনিক মিথ্যা কথা বলিয়াছে বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। রাজকুমার প্রাণরক্ষার জন্য একটি কথা বলিয়া চুপ করিলেন। সৈনিকের প্রাণরক্ষা হইল। অতঃপর পণ্ডিতগণ বলিলেন, রাজকুমার মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, ইঁহাকে কেহ বৃথা বাক্যব্যয় করিতে বলিবেন না। রাজা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন।

শ্রীভক্তদাস রাজা

ভক্তদাস নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার শ্রীরামচন্দ্রে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। প্রতিদিন তিনি এক জন ব্রাহ্মণের বাটীতে রামায়ণ গান শুনিতে যাইতেন। একদিন সীতাহরণ পালা গান হইতেছে, রাবণ চুলির মুঠো ধরিয়া সীতাদেবীকে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া রাজা ভক্তদাস অমনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া ভৃত্যদের আদেশ করিলেন, এখনই আমার সৈন্য-সামন্তদের রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিতে আদেশ কর। মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা উন্মুক্ত অসি হস্তে "কোথা যায় ব্যাটা রাবণ আমার মা জানকীকে লইয়া"—বলিয়া সেই সেনাবাহিনী সমেত ছুটিলেন। রামায়ণ গান যাহারা শুনিতে আসিয়াছিল, তাহারা অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকিল। রাজা ভক্তদাস "ঐ যে ঐ যায়, ঐ রাবণ ব্যাটা যায়" বলিয়া তীরবেগে ছুটিয়া এক সাগরের মধ্যে পতিত হইলেন। ভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় রাজার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। সৈন্য-সামন্তেরা রাজাকে তীরে উঠাইল। কিন্তু তবুও রাজা ভক্তদাস বলেন, "কোথা গেল রাবণা ব্যাটা?" ভগবান রামচন্দ্র তখন মা জানকীকে সঙ্গে লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভক্ত প্রিয় শিষ্য আমার, এই দেখ রাবণকে নিধন করিয়া আমি জানকীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। ভগবান রামচন্দ্রের কথায় তখন রাজার চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া

দেখেন, সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে নবঘনশ্যাম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা মা জানকী। ভগবান রামচন্দ্র রাজাকে রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া অনাসক্তভাবে রাজকার্য্য সমাধা করিয়া ভগবানে স্থির অবিকৃত মতি রাখিতে আদেশ করিলেন। ভগবানের আদেশে রাজা ভক্তদাস স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীনিষ্কিঞ্চণ ব্রাহ্মণ

নিষ্কিঞ্চণ নামে এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবসেবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছে, এখন আর তার বৈষ্ণব সেবায় লাগাইবার মত কিছুই নাই। নিষ্কিঞ্চণ অর্থ প্রাপ্তির অন্য উপায় না দেখিয়া শেষে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল এবং যাহা পাইতে পাগিল তদ্দ্বারা বৈষ্ণবের সেবা করিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠে আসিয়া ভগবান ভক্তের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চণের নিকট যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। এদিকে রুক্মিণী ঠাকুরাণী বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যাবে চল। অতঃপর নিষ্কিঞ্চণ গহন বনের মধ্যে যেখানে বসিয়া ডাকাতি করিয়া পথিকদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়, সেইখানে উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে একাকিনী ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটু দূরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে বনমধ্যে একাকিনী রত্নালঙ্কারভূষিতা একটি রমণীকে দেখিয়া নিষ্কিঞ্চণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, না জানি আজ

কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি, এই রমণীর অঙ্গ হইতে যদি অলঙ্কার-গুলি কাড়িয়া লইতে পারি তবে বহু বৈষ্ণবকে আমি মহোৎসবে আমন্ত্রণ করিতে পারিব। এই ভাবিয়া নিষ্কিঞ্চণ রুক্মিণীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। রুক্মিণী এদিক্ ওদিক সর্ব্বত্র চাহিয়া দেখেন, কোথাও শ্রীকৃষ্ণ নাই। তখন তিনি ভাবিলেন, বা! আচ্ছা পুরুষ লোক বটে! একাকিনী এই দুর্গম বনের মধ্যে দস্যুহস্তে স্ত্রীকে ফেলিয়া কোথায় গেল! রুক্মিণী যতই এদিক ওদিক চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন, কৃষ্ণচন্দ্র ততই সরিয়া গিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া হাসেন। তার পর দস্যু যখন একে একে রুক্মিণীর অঙ্গাভরণ সমস্ত খসাইয়া লইল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। রুক্মিণী ক্রোধে গর্‌গর্ করিতে করিতে বলিলেন, তুমি ত বড় আচ্ছা পুরুষ দেখ্‌ছি! এই ভাবে গভীর বনের মধ্যে একাকিনী নিজের পত্নীকে দস্যুহস্তে ফেলিয়া রাখিয়া এখন আসিয়া খল্‌খল্ করিয়া হাসিতেছ! শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেখ এই দস্যু—দস্যু নয়; এ আমার পরম ভক্তের ভক্ত। আমার যত ভক্ত বৈষ্ণবগণকে এ দস্যুবৃত্তি করিয়া লইয়া খাওয়ায়। রুক্মিণী, তুমি জানিও "যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ মে জনাঃ" —যাহারা কেবল আমার ভক্ত, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য নহে, যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

দেবী এই কথা শুনিয়া নিষ্কিঞ্চণের দিকে স্নেহপূর্ণ-নয়নে তাকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া চতুর্ভুজরূপে নিষ্কিঞ্চণকে দর্শন দিলেন। সেই কোটি-ইন্দু নিন্দিকান্তি দেখিয়া নিষ্কিঞ্চণ একবার তাঁহার পায়ে পড়িতে লাগিল, আরবার উঠিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভয়বাণী দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীপিপাজী।

গাঙ্গরোলের রাজা শ্রীপিপাজী মহাশাক্ত। বাটীতে এক দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। রাজা পিপাজী প্রতিদিন সেই প্রতিমাকে নিজে পূজা করিয়া তবে জলস্পর্শ করেন। একদিন একজন কৃষ্ণভক্ত সাধু পিপাজীর বাটীতে গিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিল। পিপাজি নিতান্ত অবহেলার সহিত সেই বৈষ্ণবের আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করিয়া দিলেন। রাত্রে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যেন, ভবানী শক্তিমতী যোগিনীরূপে ভয়ঙ্করা বেশে পিপাজীর সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন, "তুই আজ বৈষ্ণবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছিস্, প্রাতে উঠিয়াই সেই বৈষ্ণবের পাদপদ্ম সেবা করবি।" রাজা পিপাজী ভয়ে ভীত হইয়া পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়াই সেই বৈষ্ণবের পাদপদ্ম সেবা করিলেন। বৈষ্ণব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বৈষ্ণব কহিল, রাজা তুমি অতি ভাগ্যবান। আমরা পূজা উপাসনা করিয়া যে দেবীর কৃপালাভ করিতে পারিলাম না, আপনি অনায়াসে তাঁহার দর্শন পাইলেন। অতঃপর রাজা বৈষ্ণবের নিকট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শুনিলেন। বৈষ্ণব রাজাকে বৈষ্ণব হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা দেবীর নিকট মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিলেন, দেবী তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লইতে অনুজ্ঞা দিতেছেন। রাজা তৎপরদিন কাশীধামে গুরু রামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য গেলেন। গুরু রামানন্দের শিষ্যেরা তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই শাক্ত বলিয়া জানিতেন। তাহারা রাজাকে কিছুতেই

গুরু রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল না। তখন রাজা দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া জোড় হাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই সেখান হইতে এক পদও এদিক্ ওদিক্ হইলেন না। রাজার ঐকান্তিকতা দেখিয়া গুরু রামানন্দ তাঁহাকে "রামনামে" দীক্ষা দিলেন। অতঃপর গুরুর আদেশে রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া রামচন্দ্রের ভজন পূজন করিতে লাগিলেন। বৎসরান্তে রাজার আমন্ত্রণে গুরু রামানন্দ শিষ্যাদি সমভিব্যাহারে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাণীগণ পর্য্যন্ত রামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার সংকল্প করিলেন। রাজার সাতরাণী আসিয়া বলিলেন, রাজা তুমি যদি বনে যাইবে তবে আমরাও যাইব।" রাজা অনেক প্রকারে রাণীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাণীরা কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। তখন রাজা বলিলেন, যে রাণী অঙ্গের সমস্ত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় এই রাজসভা মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিবেন, সেই রাণীকেই বনে যাইবার জন্য সঙ্গে লওয়া হইবে। তখন একে একে সমস্ত রাণীই মুচ্‌কি হাসিয়া অন্তঃপুরে গেলেন, কেবল ছোটরাণী অঙ্গের সমস্ত হার-মণি-মুক্তা-খচিত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কটিদেশে একখানি কম্বলের টুক্‌রা মাত্র পরিধান করিয়া রাজসভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা গুরুর আদেশে সেই ছোটরাণীকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলেন। যদি স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জ্ঞান না থাকে তবে ভক্তের পক্ষে স্ত্রীকে লইয়া ধর্ম্মানুশীলন ও ভগবচ্চিন্তা করা কিছু গর্হিত কাজ নহে।

"উভয়ের রতি রাগ যাঁ যদি জন্মায়।
দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান নাহি রয়॥
তবে যে পুরুষ-স্ত্রী ভেদ কি রহিল।
সবাই সমান্ তাহে হরিভক্তি হৈল॥"

রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়

রাজসাহী জেলায় পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের বাস ছিল। তিনি শক্তির ঘোরতর উপাসক ছিলেন। একদিন দুইজন বৈষ্ণব আসিয়া রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের আতিথ্য গ্রহণ করিল। রাত্রে মহামায়ার প্রসাদ—নানাবিধ মিষ্টান্ন লুচি আনিয়া বৈষ্ণবগণকে আহারার্থে দেওয়া হইল। বৈষ্ণবেরা তাহা খাইলেন না, বলিলেন তাহারা বিষ্ণুর প্রসাদ ছাড়া অন্য কাহারও প্রসাদ খান না। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। শেষে বৈষ্ণবদ্বয় যখন বলিলেন যে, মহারাজ নন্দকুমার তাহাদের পরম ভক্ত, তখন রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ চুপ করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, ওহে বৈষ্ণবদ্বয়, তোমরা মহামায়ার প্রসাদ কেন খাইবে না, তাহার কোন শাস্ত্রীয় কারণ দেখাইতে পার কি? বৈষ্ণবেরা তখন বলিতে লাগিলেন :—

স্কান্দে :—

নাশ্নীয়াদন্য দেবস্য নির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবঃ সদা।
নান্যস্যোপাসনা কার্য্যা প্রাণাঃ কণ্ঠাগতা যদি॥"

প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও, বৈষ্ণববৃন্দ অন্য দেবতাগণের উপাসনা কিংবা তাঁহাদের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

সত্ত্বংরজস্তম—ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্যধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরোতি সংজ্ঞা
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, প্রকৃতির এই গুণত্রয় সমন্বিত এক পরম পুরুষার্থ যদিও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই সংজ্ঞা ত্রয়ে এই সংসার ধারণ করেন, তথাপি মনুষ্যের পক্ষে সত্ত্বস্বরূপ বাসুদেবই শ্রেয়োজনক সন্দেহ নাই।

পাদ্মঃ—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবো হ্যাসুর এব চ।
বিষ্ণু ভক্তো ভবেদ্ দৈবো হ্যাসুর স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

ইহলোকে দৈবী আসুরী দুইরূপ প্রাণী সৃষ্টি; দৈবী সৃষ্টি বিষ্ণুভক্তগণ এবং আসুর সৃষ্টি তদ্বিপরীতগণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে :—

গুরু র্ন স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ,
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

তিনি গুরু নহেন, স্বজন নহেন, পিতা নহেন, জননী নহেন, দেবতা নহেন, পতি নহেন—যিনি মৃত্যু হইতে মোচন করিতে না পারেন।

ব্রহ্ম সংহিতায়াম্—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণৈকং শরণং ব্রজ।"

বৈষ্ণবের মুখে এই সমস্ত উপদেশ শুনিয়া রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ ত গোপিনীদের সহিত অতি কুৎসিৎ ভাবে রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি করিয়া পূজা করিব? ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবদ্বয় বলিল :—

"মৎকামা রমণং জারমাস্বরূপ বিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত সহস্রশঃ॥

অর্থাৎ মৎপ্রতি কামনাবিশিষ্ট অবলাগণের সহিত রতিক্রীড়ায় আমি উপপতি স্বরূপ প্রতীয়মান হইলেও তাহারা আমাকে পরব্রহ্মরূপেই লাভ করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গলাভে অপর শত সহস্র ব্যক্তিও আমাকে সেইভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই বলিয়া বৈষ্ণবদ্বয় বলিলেন, দেখুন মহারাজ, আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে গেলে পশুবলি, নরবলি, যাগ, যজ্ঞ কিছুই করিতে হয় না, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ডাকেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

"ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনম্॥"

দানে নহে, তপস্যায় নহে, শৌচে নহে, ব্রতাদিতে নহে, কেবল নির্ম্মল ভক্তিতেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন, অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা।

মহারাজ যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা না হয়, তাহার গৃহ শ্মশান তুল্য, সেখানে বৈষ্ণবের বাস করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।

যদাগারেঽ কৃষ্ণ সেবা কার্ষ্ণা সেবা তথৈব চ।
শ্মশান তুল্যং তদ্‌গৃহং স এব শ্বপচাধমঃ॥

ভগবান বলিয়াছেন,

সকৃদেব প্রপন্নৌ যস্ত বাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

"তোমারই হইলাম" বলিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমি নিরন্তর তাহাকে অভয় প্রদান করি, ইহা আমার ব্রত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে গেলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বৈষ্ণবদ্বয় বলিলেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥

ইতি পুংসা পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা।
ক্রিয়তে ভাগবত্যদ্ধা তন্মন্যে ধীতমুত্তমম্॥

বিষ্ণুর নামগুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তদীয় পাদসেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্য, তাঁহাতে সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই সব লক্ষণাবিশিষ্ট ভক্তি পুরুষ কর্ত্তৃক যদি একমাত্র ভগবান্ হরিতে অর্পিত হয়, তাহাই উত্তম অনুশীলন।

মহারাজ, আপনারা তপস্যার তাপেই সন্তপ্ত হউন, গিরি হইতেই পতিত হউন, তীর্থাদিই পর্য্যটন করুন, আগমাদিই অধ্যয়ন করুন, যাগ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করুন, অথবা তর্কাশ্রয়ে বিবাদই করুন, শ্রীহরির সাহায্য ভিন্ন কেহ মৃত্যুমুখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন না।

বৈষ্ণবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিয়া রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ তৎক্ষণাৎ করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীপাট মালিহাটীতে যাইয়া শ্রীমান্ আচার্য্য সন্তানদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বৃন্দাবনে যাইয়া তথাকার সমস্ত বৈষ্ণবগণকে মহোৎসব দিলেন। আজও বৃন্দাবনে রাজা রবীন্দ্র-নারায়ণের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে।

জগদেব পামর।

জগদেব পামর মহা কৃষ্ণভক্ত। জগদেবের বাড়ী যে দেশে সেই দেশের রাজা তাহার কন্যাকে বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন, কন্যাটী বলিল সে জগদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। জগদেব

সাধু, সজ্জন, কৃষ্ণভক্ত। রাজা কন্যার এই অভিপ্রায়ে বিশেষ কিছু দুঃখিত হইলেন না। জগদেবকে ডাকাইয়া রাজা বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আমাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত কর। জগদেব বলিল, মহারাজ, আমি বিবাহ করিব না, বনে চলিয়া যাইব। রাজকুমারী জগদেবের কথা শুনিয়া একেবারে অন্ন জল ত্যাগ করিলেন। একদিন রাজা রাজসভায় কৃষ্ণলীলা গান করিবার জন্য একজন নটীকে আহ্বান করিলেন। জগদেবকেও সেই গান শুনিতে আহ্বান করা হইল। নটীনী এমন সুন্দর গান করিল যে, জগদেব সঙ্গীতান্তে নটীকে বলিল, "দেখ, তুমি এমন সুন্দর গান করিয়াছ যে, তোমাকে কিছু পারিতোষিক দিতে আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি অতি দীনহীন—আমার ত কিছুই নাই। তবে এই লও আমার শির লও।" এই বলিয়া জগদেব নিজের মাথাটি কাটিয়া নটীর সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। এদিকে চিকের আড়াল হইতে রাজকুমারী ইহা দেখিয়া একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইলেন! আমার স্বামী যে পথে গেলেন, আমিও সেই পথে যাইব বলিয়া রাজকুমারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজা ও রাণী রাজকুমারীকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রাজকুমারী বলিলেন, যদি আমার স্বামীর কাটামুণ্ড আমাকে আনিয়া দিতে পার, তবে আমি নিরস্ত হইতে পারি। তখন রাজা ও রাণী সেই কাটামুণ্ড আনিয়া রাজকুমারীকে দিলেন, রাজকুমারী মুণ্ডটি একটী থলিতে পূরিয়া রাখিলেন। রাজকুমারী মুণ্ডটীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন, আর মুণ্ডটী অমনি পশ্চাৎ ফিরিয়া বসে। তখন রাজকুমারী মস্তক বিহীন দেহটি আনিয়া মুণ্ডটী তাহাতে সংযোগ করিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে জগদেবের দেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাজকুমারী করযোড়ে জগদেবকে

বলিল, আমি তোমার সহিত কোনপ্রকার দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহি না, আমি আপনার দাসীরূপে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিব, আমাকে এই অধিকারটুকু প্রদান করুন। রাজকুমারী যে একজন পরম কৃষ্ণভক্ত, জগদেবের আর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীরূপে রাজকুমারীকে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। তখন রাজকুমারী জগদেবের সহিত সমস্ত বিষয় বিভব ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনস্থানে চলিয়া গেলেন। উভয়ে কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধু-নীরে নিমগ্ন হইয়া মহা আনন্দে ভগবচ্চিন্তায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এতাদৃশ ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া রাজা ও রাণীর আনন্দের আর সীমা থাকিল না।

শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজা

পুরাকালে রুক্মাঙ্গদ রাজা নামে একজন ভাগ্যবান রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ সন্নিকটে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম-বৃক্ষ পরিশোভিত সুন্দর পুষ্পোদ্যান ছিল। একদিন এক দেবাঙ্গনা রুক্মাঙ্গদ রাজার ভক্তির গাঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য সেই পুষ্পোদ্যানে আসিয়া পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি বার্ত্তাকুর কাঁটা দেবাঙ্গনার চরণে বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইল, আর তিনি স্বর্গে যাইতে পারিলেন না। মালীরা দেবকুমারীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রাজার



নিকট গিয়া বলিল, মহারাজ! একজন দেবাঙ্গনা বেগুন তুলিতে আসিয়াছিলেন, পায়ে তাঁহার কাঁটা বিদ্ধ হওয়ায় তিনি আর স্বর্গে যাইতে পারিতেছেন না। রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দেবকন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন, বলুন কি উপায়ে আপনার স্বর্গ গমনের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারি ?

দেবকন্যা বলিলেন, তোমার রাজ্যে যদি আজ কেহ একাদশী ব্রত করিয়া থাকে, তবে তাহার কিছু ফল আমাকে দিলে আমি স্বর্গে গমন করিতে পারি। রাজার আদেশে তখন তাঁহার পরিচারকগণ গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ তাহাদের মধ্যে একাদশী করিয়া আছে কি না ? কিন্তু কেহই অনুকূল উত্তর দিল না। কেবল এক বণিকের বাড়ীতে গিয়া তাহারা শুনিতে পাইল যে, সেই বণিকের স্ত্রী কলহ করিয়া সারাদিন কিছুই খায় নাই। সেদিন যে একাদশী সেই বণিকের স্ত্রী তাহা জানিত না।

দেবকন্যা সেই বণিকের স্ত্রীকে কহিলেন, তুমি যে একাদশী ব্রত করিয়াছ যদি তাহার কিঞ্চিৎ ফল আমাকে অর্পণ কর, তাহা হইলে আমি উদ্ধার হইতে পারি। বণিকের পত্নী দেবকন্যার কথা শুনিয়া ত একেবারেই অবাক্! পরে বণিক-পত্নী বলিল, সে কি কুমারী, আমি আবার একাদশী করিলাম কবে ? দেবকুমারী বলিলেন, কেন আজ কি তুমি তোমার স্বামীর সহিত কলহ করিয়া সারাদিন উপবাস করিয়া দিন কাটাও নাই ? এই উপবাসকেই একাদশী কহে। একাদশীর দিন এইরূপ উপবাস করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

বণিকের পত্নী তখন বলিল, আচ্ছা আমি আমার একাদশী-ব্রতের কিঞ্চিৎ ফল আপনাকে দান করিতেছি। দেবকুমারী তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। একাদশীর মহিমা দেখিয়া রাজা রুক্মাঙ্গদ,

একেবারে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি সেইদিন রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে একাদশীর দিন কেহ উপবাস না করিয়া থাকিতে পারিবে না। একাদশীর দিন তাঁহার রাজ্যে কেহ জল-বিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না। যে সময় রাজা এই আদেশ প্রচার করেন, সে সময় রাজকুমার রাজধানীতে ছিলেন না, অন্যত্র গিয়াছিলেন। তিনি একাদশীর দিন রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রীর নিকট আহার্য্য চাহিলেন, স্ত্রী একবিন্দু জলও দিলেন না। দাস দাসী পরিচারক পরিচারিকাদের কাছে একবিন্দু জলের জন্য রাজকুমার কত কাকুতি-মিনতি করিলেন, কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। কিরূপে করিবে? রাজার কঠোর আদেশ—একাদশীর দিন কেহ কাহাকেও জলবিন্দু দান করিলে তাহার জীবন থাকিবে না।

রাজার তনয় চিরদিন সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত। সংসারের তিলমাত্র দুঃখ তাঁহার জীবনে তিনি অনুভব করেন নাই। উপবাসের তীব্রজ্বালা কখনও তিনি কল্পনাও করেন নাই। আজ অকস্মাৎ উপবাসে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িল, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল—জীবনী-শক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। রাজকুমার সারারাত্রি একবিন্দু জলের জন্য কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে একবিন্দু জল দিল না, কাজেই রজনী প্রভাত হইতে না হইতে রাজকুমার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু একাদশীর ফল যাইবে কোথায়? রাজবাটীর সকলে দেখিল রাজকুমার দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন।

মহারাজ রুক্মাঙ্গদও একাদশী ব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একাদশী-নিষ্ঠা দর্শনে অতি মাত্র প্রীত হইলেন। ভাগবত বলিয়াছেন, সর্ব্বব্রতের মধ্যে একাদশী ব্রতই

সর্ব্বোত্তম। যে ব্যক্তি নিষ্ঠা সহকারে একাদশী ব্রত উদ্‌যাপন করে সেই ব্যক্তি অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হয়।

শ্রীলালাচার্য্য।

লালাচার্য্য রামানুজ স্বামীর জামাতা ছিলেন। তিনি অতি ভক্তিমান্ ও বৈষ্ণবে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। গুরু তাঁহাকে বৈষ্ণবের সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। লালাজী প্রাণপণে তাহাই করিতেন। যাহারই ললাটে তিলক, পরিধানে কৌপীন দেখেন, লালাজী তাঁহাকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। একদিন লালাচার্য্য দেখিতে পান যে, নদীর উপর দিয়া একটি শবদেহ ভাসিয়া যাইতেছে, সেই শবটী বৈষ্ণবের শব বলিয়া অনুমিত হইতেছে। শবের গলায় তুলসীর মালা, নাসিকার উপর তিলক দেখিয়া লালাজী ভাবিতে লাগিলেন ইহা নিশ্চয়ই কোন বৈষ্ণবের শবদেহ। আহা! এই শব ত আমার ভাই! কেমন করিয়া আমার ভাই জলের মধ্যে পড়িল, এমন কি কেহ তীরে ছিল না যে আমার ভাইকে রক্ষা করে!

এই কথা বলিয়া লালাচার্য্য ঝম্প দিয়া নদীর ভিতরে পড়িলেন। শবদেহ ধরিয়া নদীর তীরে উঠিলেন। শবদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া লালাচার্য্য কাঁদিতে লাগিলেন। লোকজন লালাচার্য্যের ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, লালাচার্য্য তুমি কাঁদিতেছ কেন, কার শবদেহ তুমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছ? লালাচার্য্য বলিলেন, আমার ভাই,

মারা গিয়াছে। লোকেরা লালাচার্য্যের ভাব দেখিয়া তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে চলিয়া গেল। তারপর লালাচার্য্য সেই শবদেহ লইয়া বাড়ীতে আসিলেন, বহু বৈষ্ণবকে আনিয়া নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবের দেহ দাহ করিলেন। তারপর মিষ্টান্ন, পক্কান্ন প্রভৃতির আয়োজন করিয়া মহোৎসবে সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, নিজের আত্মীয় কুটুম্ব সকলে বলিল, কোথাকার কোন্ জাতের মড়া আনিয়া পোড়াইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, অতএব উহার বাড়ীতে খাওয়া হইবে না। বৈষ্ণবেরা ব্রাহ্মণদের ভয়ে সকলে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল না।

তখন লালাচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুর কাছে গিয়া বলিলেন, প্রভু একটি বৈষ্ণবের শবদেহ আনিয়া দাহ করায় আমার বাড়ীতে কেহই মহোৎসবে যোগদান করিল না। গুরুদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি দুঃখিত হইও না, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ইহার প্রতিকার করিবেন।

গুরুর কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া লালাচার্য্য দেখেন আকাশ হইতে শত শত বিমান নামিতেছে আর শত শত বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতেছেন। কে যে তাহাদের পরিবেশন করিতেছেন—কে যে খাদ্য সামগ্রী যোগাইতেছেন, কতজন যে খাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। এইভাবে বৈষ্ণবেরা সকলে খাইয়া যখন বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন, তখন অভিমানী ব্রাহ্মণগণের চমক ভাঙ্গিল। স্বর্গ হইতে অসংখ্য-রথ আসিতে দেখিয়া—ব্রাহ্মণগণ লালাচার্য্যের মহিমা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা একে একে আসিয়া আচার্য্যের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। আচার্য্য বলিলেন, আমার কাছে ক্ষমা চাহিবার দরকার

নাই, তোমরা সকলে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাও, তাহা হইলে ভগবান্ তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবদের যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট ছিল তাহা খাইলেন। হৃদয়ে অপূর্ব্ব তৃপ্তি আসিল। ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবের মহিমা বুঝিতে পারিয়া সকলে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লইলেন।

শ্রীরন্তিদেব।

মহারাজ চক্রবর্ত্তী রন্তিদেব অতুল ধনৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও কৃষ্ণের উপর তাঁহার অনন্য ভক্তি। মহারাজ ভোগসুখের দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। যদি কেহ অযাচিতভাবে তাঁহাকে এক মুঠো অন্ন দেয়, মহারাজ রন্তিদেব শ্রীকৃষ্ণকে উৎসর্গ করিয়া তাহাই সেবা করেন। একবার আট চল্লিশ দিন ব্যাপী মহারাজকে কেহ অন্ন দিল না, মহারাজও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেন না। ঊনপঞ্চাশ দিনের দিন একজন ভক্ত তাঁহাকে কিছু অন্ন দিল, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভক্তির গাঢ়তা পরীক্ষা, করিবার নিমিত্ত শূদ্রবেশে একটী কুকুর সমভিব্যাহারে রন্তিদেবের বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। মহারাজ আগন্তুককে, অভুক্ত দেখিয়া সেই পরমান্ন অভ্যাগতকে ও কুকুরটিকে বাঁটিয়া দিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর ত আমার ঘরে কিছু নাই যে, আজ অতিথিসৎকার করি।

শ্রীকৃষ্ণের উপর মহারাজ রন্তিদেবের অপার ভক্তি দেখিয়া ভগবান্ ভাবিতে লাগিলেন, এই রন্তিদেবের আমার প্রতি কি অকাট্য ভক্তি! রাজ্যধন-ঐশ্বর্য্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া রাজা কেবল নিশিদিন আমারই উপাসনা করে! আর ইহাকে ছলনা করা উচিত নহে। এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ প্রকাশ করিলেন :—

"নব ঘনশ্যাম বনমালী পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মনোহর মৃদুহাস॥"

সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রাজা শ্রীকৃষ্ণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া মহা সমাদরে তাঁহাকে রত্ন-সিংহাসনে বসাইলেন।

ভগবানের জন্য ভক্তের প্রাণ এমনি আকুল হয়। যাহার প্রাণ ভগবানের জন্য এরূপ আকুল হয়, ভক্তবৎসল ভগবান কতক্ষণ তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? ভগবান্ যে ভক্তাধীন। তাঁহার কঠোর পরীক্ষায় যে ভক্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে, ভগবান স্বরূপ দেখাইয়া তাহাকে ভব-কারাগার হইতে উত্তীর্ণ করেন। রন্তিদেব এই কঠোর ভক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নবচিদ্ঘনরূপ দেখাইয়া তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান দিয়াছিলেন। যে তাঁহাকে রন্তিদেবের ন্যায় একনিষ্ঠ হইয়া পূজা করিতে পারে—ডাকিতে পারে কতক্ষণ ভগবান্ তাহার ডাকে নিস্তব্ধ থাকিতে পারেন?

ভগবানকে পাইতে গেলে—তাঁহার নব-জল-ধর মোহন মুরলীধারী রূপ দেখিতে গেলে ভগবানের উপর রন্তিদেবের ন্যায় একনিষ্ঠ প্রেম চাই।

চন্দ্রহাস রাজা।

চন্দ্রহাস এক রাজার ছেলে। তাহার পিতা চন্দ্রহাসকে বিপদের সময় অন্য এক রাজার বাড়ীতে লইয়া রাখিয়া আসিলেন। রাজা শিশু চন্দ্রহাসকে রাজবাড়ীতে রাখিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। একদিন রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, চন্দ্রহাস অন্যান্য শিশুদের সহিত সেইখানে গেলেন। সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শিশু চন্দ্রহাসকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এই শিশু ভবিষ্যতে রাজ-জামাতা হইবে। সেই কথা ক্রমে ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল, রাজা বলিলেন, কি আশ্চর্য্যের কথা! এই দাসীপুত্র কি না আমার জামাতা হইবে? এই ভাবিয়া রাজা চন্দ্রহাসকে মারিবার জন্য জল্লাদকে আদেশ দিলেন। জল্লাদেরা শিশুকে মারিবার জন্য মশানে লইয়া গেল, চন্দ্রহাস জল্লাদদিগকে বলিল, দেখ আমি কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শেষ চিন্তা করিয়া লইব, তারপর যখন আমি মাথা হেলা করিব, সেই সময় তোমরা আমার মাথায় খড়্গ নিক্ষেপ করিবে। এই বলিয়া চন্দ্রহাস শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবার পর মাথা হেলাইয়া চন্দ্রহাস বলিল, এইবার আমায় কাট। শিশুর মুখে আর্ত্তনাদ নাই— একটু বিষণ্ণতা নাই, তাহা দেখিয়া জল্লাদগণের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা শিশুকে না কাটিয়া শিশুর একহাতে যে ছয়টি অঙ্গুলী ছিল, তন্মধ্যে একটি বৃদ্ধ অঙ্গুলী কাটিয়া লইল। জল্লাদেরা রাজধানীতে ফিরিয়া রাজাকে বলিল, তাহারা চন্দ্রহাসকে কাটিয়া তাহার নিদর্শন

স্বরূপ তাহার একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লইয়া আসিয়াছে। রাজা জল্লাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন।

এদিকে চন্দ্রহাস মশান হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে অরণ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সেই বনে যে রাজা চন্দ্রহাসকে কাটিবার আদেশ করিয়াছিলেন, সেই রাজার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রহাসকে বনমধ্যে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিজের রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। কালক্রমে এই রাজা পূর্ব্বোক্ত রাজার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া বহু দাসদাসী ও ধনরত্ন ভেট স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। চন্দ্রহাসও তাহাদের সহিত ভেটস্বরূপে প্রেরিত হইলেন। চন্দ্রহাসকে দেখিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, ইহাকে ত জল্লাদেরা মারিয়া ফেলিয়াছে, এ পুনরায় এখানে কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই তবে জল্লাদেরা আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহারা বালকটিকে না কাটিয়া আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে! কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে যে চন্দ্রহাস মরিয়াও মরে নাই, এ কথা রাজার মনে স্থান পাইল না। তিনি চন্দ্রহাসকে হত্যা করিবার জন্য আবার অভিসন্ধি করিতে লাগিলেন।

রাজার কন্যা বিষথা রাজধানীর অনতিদূরে একটি উপবনের মধ্যে ভ্রাতার নিকট বাস করেন। রাজা চন্দ্রহাসকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়া পুত্রের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রহাস সেই চিঠিখানি লইয়া রাজপুত্রের নিকট গেল।

রাজপুত্র চন্দ্রহাসের সুন্দর সুঠাম অঙ্গকান্তি, সৌন্দর্য্য, রূপলাবণ্য দেখিয়া ভাবিলেন, রাজা নিশ্চয়ই এই বালকটিকে তাহার ভগ্নীর সহিত বিবাহের জন্য পাঠাইয়াছেন। এই ভাবিয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ বিষথার সহিত চন্দ্রহাসের বিবাহ দিয়া দিলেন। রাজপুত্রকে রাজা বিষ দিতে বলিয়া-

ছিলেন, রাজপুত্র বিষের পরিবর্ত্তে বিষে দিয়া দিলেন। রাজকুমারীর ডাক নাম "ভবিষে"। অতঃপর চন্দ্রহাস ও রাজকুমারী হাতে হাত দিয়া স্বামী স্ত্রীবেশে রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিয়া একেবারে শিরে করাঘাত করিলেন। বলিলেন, এ কি দুর্দ্দৈব! আমার মেয়ের কি না শেষে এক দাসীপুত্রের সহিত বিবাহ হইল! কেন এরূপ দুর্লক্ষণা কন্যা আমার হইল! কেন সে গর্ভবাসে মারা গেল না—কেন নিষ্ঠুর যম তাহাকে সরাইয়া লইল না? রাজা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রহাসকে পুনরায় মারিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কন্যা বিধবা হইবে—সেও ভাল, তবুও চন্দ্রহাসকে মারিতে হইবে। বিবাহের পর দেবীপূজা কুলকর্ম্ম করিতে হয়, রাণীগণ রাজপুত্রগণ সকলেই বর লইয়া দেবীমন্দিরে গেলেন। রাজা চন্দ্রহাসকে মারিবার জন্য একজন ঘাতক পাঠাইলেন। চন্দ্রহাস কিন্তু ইহার কিছুই জানেন না। তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ধারণা করেন, শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বদা তাঁহার মতি।

দেবীর পূজা হইল, সকলে চন্দ্রহাসকে দেবীর চরণে প্রণাম করিতে বলিল। চন্দ্রহাস শির নত করিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন, অমনি ঘাতক খড়্গ উত্তোলন করিয়া চন্দ্রহাসকে বলি দিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণ-ভক্তের প্রতি এতাদৃশ লাঞ্ছনা দেবী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ দেবী-প্রতিমার ভিতর হইতে একটি উগ্রমূর্ত্তি বাহির হইল, রাজপুত্র আদি নীচমনা লোকগণকে সেই উগ্রমূর্ত্তি কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলেন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ দেবীর সমক্ষে গিয়া আত্মঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমা! রাজা রাজপুত্র সকলেই মারা গেলেন। তখন প্রজাগণ মহা সমাদরে রাজজামাতা চন্দ্রহাসকে লইয়া সেই রাজসিংহাসন বসাইলেন। চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনে বসিয়া

চারিদিকে কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রজাসকল চন্দ্রহাসের রাজত্বে মহা-আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল এবং দুই হাত তুলিয়া সকলে চন্দ্রহাসের গুণগান করিতে লাগিল।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী

ত্রিজগতে চৌদ্দ ভুবনে মুনিবর শুকদেবের তুলনা নাই। শুকদেব নাড়ী সহ মাতৃ-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতাপিতাকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। পথের মাঝে কত নদী, কত সরোবর, কত পর্ব্বত রহিয়াছে, শুকদেবের সে দিকে দৃষ্টি নাই। মাতাপিতার পার্থিব স্নেহভোগও শুকদেবকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। শুকদেব শ্রীকৃষ্ণে অগাধ ভক্তি বিশ্বাস লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পথে চলিতে কত হিংস্র-শ্বাপদ জন্তু তাঁহার সমক্ষে পড়িতেছে, শুকদেবের সে দিকে লক্ষ্য নাই—বিন্দুমাত্র ভয় নাই। শুকদেব অনন্যমনে শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। পথিমধ্যে কোন বৃক্ষ থাকিলে বৃক্ষ দুই ভাগ হইয়া তাঁহাকে পথ দিতেছে, কোনও পর্ব্বত থাকিলে পর্ব্বত আপনা হইতে মাথা নীচু করিয়া শুকদেবের গমন পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র শুকদেবকে দেখিয়া আপনা হইতেই পথ ছাড়িয়া বনাভ্যন্তরে চলিয়া যাইতেছে।

তাঁর দু'নয়নে নব কজ্জল, অবিরাম দু'চোখ বহিয়া কৃষ্ণপ্রেমের ধারা বহিতেছে। দেহ যেন নব-জলধর—সেই নব জলধরের মধ্য হ'তে যেন থাকিয়া থাকিয়া জলবর্ষণ হইতেছে। শুকদেবের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন একটী ছোট করভ-শিশু শুণ্ড হেলাইয়া দুলাইয়া মন্থরগমনে চলিয়া যাইতেছে। কি রূপ তাঁহার! যেন একখানি জ্বলন্ত চিত্রপট হরিগুণগান করিতে করিতে পথ বাহিয়া চলিতেছেন।

শুকদেব ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, জপ, জ্ঞান, যজ্ঞ, তপ আদি যা কিছু করণীয় কাজ সমস্তই সম্পাদন করেন। দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক আসিয়া শুকদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। শুকদেবের অপার কৃষ্ণভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। কৃষ্ণের অপার অনুগ্রহে শুকদেব যেমন দুস্তর ভবজলধি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁর হাজার হাজার শিষ্যকেও তিনি ভবপয়োধি হইতে মুক্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-মাধুর্য্য লাভ করাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্রপ্রচার করিয়া পরম ভগবদ্ভক্ত শুকদেব কত শত পাপীতাপীকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীভক্তরাজ অক্রূর।

যখন কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্ম-জ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান হয়, তখন আর ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়া থাকিতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়ো পেতাস্তে মে যুক্ততমাঃ মতাঃ॥"

যাঁহারা মন্নিষ্ঠ হইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শীঘ্রই সংসার-সাগরের পারে লইয়া যান। যথা :—

যে তু কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ময়ি সন্নস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যা বেশিত চেতসাম্।

অর্থাৎ যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যপরা ভক্তি দ্বারা আমারেই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরকাল মধ্যেই মরণশীল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

যাহার দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের কৃপা আকৃষ্ট হয় ও বাসনা সকল পূর্ণ করে, তাহাই ভক্তি।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"

পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে। জ্ঞান কর্ম্ম, ভুলিয়া সুখ দুঃখ ভুলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া ধনৈশ্বর্য্য ভুলিয়া, স্ত্রী পুত্র এমন কি আপনা ভুলিয়া ঈশ্বরে যে ঐকান্তিক অনুরক্তি তাহার নাম ভক্তি। কেবল চক্ষু মুদিয়া, "তুমি করুণাময় পরমেশ্বর দয়ার সাগর" বলিলেই ভক্তি হয় না।

"লক্ষণাং ভক্তি যোগ্য ধন্য নির্গুণস্যহ্যদা হৃতম্।
অহৈতুক্য,ব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে॥

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈ কত্বমপ্যুতে।
দীয়মানং ন গৃহ্নতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
সর্ব্বৈব ভক্তি যোগাখ্যা আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যে নাতি ব্রজ্য ত্রিগুণনাম্মদ্ভাবায়োপপদ্যতো।"

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ।

নির্গুণ ভক্তিযোগ কিরূপ? আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি, আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও কলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদদর্শন বর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এইরূপ ভক্তিবিশিষ্ট যোগীর কোনই কামনা থাকে না—অধিক কি তাহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য সারূপ্য এবং একত্ব (সাযুজ্য) এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত কিছুই চাহেন না। এইপ্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। মানব ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভক্তির সাধনা রাগমার্গ, সুতরাং যাহার যেরূপ অনুরাগ, তিনি ভগবান্‌কে সেইরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের মত সাজাইয়া ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় বিধি-নিষেধ, শাস্ত্র উপদেশ সমস্তই ভাসিয়া যায়। রাগমার্গের সাধনা ও সাধকের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। ভক্তির সাধনার ক্রমে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তখন সাধক শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্ত ও মধুর প্রভৃতি প্রেমের উচ্চ উচ্চ স্তরের মাধুরী-লীলায় বিভোর হইয়া যান। সাধক সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব-দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি জানেন—

বিস্তার সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্ব মিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্য মাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥

বিশ্ব, জগৎ, সর্ব্বভূত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইজন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। কিন্তু স্ত্রী, পুরুষ ভেদ-জ্ঞান থাকিতে সাধক, প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। পুরাণের হর-গৌরী মূর্ত্তি জ্ঞান ও প্রেমের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। প্রেমরূপ কাচাবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে ভগবদ্ভক্তি জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়।

ভক্তির এই চরম অভিব্যক্তি দেখিতে পাই আমরা অক্রূরের জীবনীতে। দুরাচার কংস কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাইকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য অক্রূর কৃষ্ণবলরামকে লইয়া আসিলেই কংস দুই ভাইকেই বিনাশ করিবে। কংসের ভয়ে অক্রূর বৃন্দাবনে গেলেন বটে, কিন্তু যাইয়াই ভুলিয়া গেলেন যে, তিনি কংসের হাতে রামকৃষ্ণ দুই ভাই:ক সমর্পণ করিবার জন্য আসিয়াছেন। অক্রূর কোন্ প্রাণে জানিয়া শুনিয়া জগতের যিনি পতি সেই গোকুলপতি সোনার চাঁদ শ্রীকৃষ্ণকে আজ শত্রু-করে সমর্পণ করিবেন। তাই অক্রূর পথে বাহির হইয়াই ভাবিতে লাগিলেন—

"হেন কি আমার তবে হইবে সুদিন।
হেরিব শ্রীহলধর নন্দের নন্দন ॥
শ্রীচন্দ্রবদন হেরি চরণে পড়িব।
খুড়া বলি উঠাইয়া আলিঙ্গন দিব ॥"

ভক্তরাজ অক্রূর এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রজধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে রামকৃষ্ণকে দেখিয়াই অক্রূরের—

"পুলক-হৃদয় দেহ অশ্রু বহে ধারে।
গড়াগড়ি দিয়া তাহে দণ্ডবৎ করে॥
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে উন্মত্তের প্রায়।
কভু হাসে কভু কান্দে উন্মত্তের প্রায়॥
কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণ শশী।
হেরিয়া অক্রূরে আলিঙ্গন কৈলা আসি॥
করে ধরি গৃহে আনি আতিথ্য-ব্যাভারে।
নানামত সেবা কায়মনোবাক্যে করে॥
নর-লীলা লৌকিক ব্যভারে দুই ভাই।
অক্রূরে সেবয়ে পান-ভোজন করায়॥

ভগবান ভক্তাধীন। ভক্তের জন্য ভগবান এইরূপই করিয়া থাকেন। যে তাঁকে আকুলপ্রাণে দেখিবার জন্য আসে, যে তাঁহার জন্য কাঁদে ভগবান্ কতক্ষণ তাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? তিনি ভক্তের দাস—ভক্তের বাঞ্ছা-কল্পতরু। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে। তেমনি ভক্তের মনও সর্ব্বদা ভগবানকে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল প্রভেদ নাই। তিনি ভক্তিতে চণ্ডালেরও দ্বারে বাঁধা, ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের তিনি নন। অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছতেও প্রকাশ পায়, সে ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ নহে; সে বিপ্রেন্দ্র—সে মুনি—সে শ্রীমান্—সে যতি—সে পণ্ডিত।

"অষ্টবিধা হ্যেষা ভক্তি কস্মিন্ ম্লেচ্ছোঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥"

ভক্তিতে ধনী দরিদ্র পার্থক্য নাই। যে ভক্তিমান সে দরিদ্র হইলেও ভগবান্ তাহাকেই আলিঙ্গন করেন।

ব্যাধের ছেলে কালকেতুর কি ধন ছিল? ধ্রুবেরই বা কি বয়স

হইয়াছিল? কুব্জার এমন কি চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য ছিল? বিপ্র সুদামেরই বা কি ঐশ্বর্য্য ছিল? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন ইঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন?—তাঁহারা অকপট ভক্তি-ধনের অধিকারী ছিলেন বলিয়া—ভগবানে তাঁহারা সরল বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, রাজার দেওয়ান রামানন্দ রায় ধনী হইলে কি হয়, তাঁহার অকপট ভক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেরও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

অক্রূরও এই শ্রেণীর ভক্ত। অক্রূর কৃষ্ণারি কংসের বন্ধু। কিন্তু বন্ধু হইলে কি কৃষ্ণ ভক্তি অক্রূর ভুলিতে পারেন? যে মদনমোহন, মোহন মুরলীধারী বাঁকা শ্যামের মোহন মুরলীধ্বনি শুনিয়া শিখী পেখম মেলিয়া নৃত্য করিতে থাকে, যে মুরারিমোহনের মধুর বাঁশীর তানে তান মিশাইয়া শিলীমুখ গুঞ্জন করিতে থাকে, যে শ্যামসুন্দরের চন্দন-চর্চ্চিত নীল-কলেবর একবার বক্ষে ধারণ করিবার জন্য গোপীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে, অক্রূর কোন্ প্রাণে আজ সেই বৃন্দাবন-নন্দকে কংসের হাতে সমর্পণ করিবেন?

ভক্তির প্রবল-প্লাবনে কংসের বন্ধুত্ব কংসের নির্য্যাতনের ভয় অক্রূরের মন হইতে দূর হইয়া গেল—অক্রূর ব্রজে আসিয়াই নারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িলেন।

ভগবানের জন্য ভক্তের প্রাণে এমনই প্রেমের বন্যা বহিয়া থাকে। ভক্ত ভগবান্‌কে রক্ষা করিবার জন্য এমনই ত্যাগ করিয়া থাকেন।

শ্রীরঙ্গ-বণিক

শ্রীরঙ্গ-বণিকের বাটী স্থোলা নামক গ্রামে। ব্যবসায়ে রঙ্গ-বণিক মগু বিক্রেতা। রঙ্গ-বণিকের এক ভৃত্য নিজ কর্ম্মফলের দোষে মরিয়া যমদূত হয়। দূত হইয়াই সে রঙ্গ-বণিকের পুত্রের প্রতি কু-দৃষ্টি করিতে থাকে। রঙ্গ-বণিকের পুত্র দিন দিন ক্ষীণতনু হইতে লাগিল। ব্যাধি নাই, রোগ নাই, ঘৃত-দুগ্ধ নবনীতের অভাব নাই, রঙ্গ-বণিকের পুত্রটি দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। রঙ্গ-বণিক ইহার কোনই কারণ বুঝিতে পারিতেছে না। এ দিকে সেই দূত বালকটিকে বলে তুমি আমার মুক্তির উপায় বিধান কর, নতুবা তোমায় আমি প্রাণে মারিব। কে কোথা হইতে তাহাকে এ কথা বলে বালক তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। একদিন বালকটি দেখিল একজন শকট-চালক গোযানে করিয়া নানা দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে, সেই প্রেত বালকের শৃঙ্গ দু'টি ধরিয়া উৎপাটিত করিয়া ফেলিল, বালকটির বক্ষঃস্থলে এক লাথি মারিয়া বালকটিকে মারিয়া ফেলিল, তারপর মানুষ যেমন অবহেলে উকুন মারিয়া ফেলে, তেমনি ভাবে শকট-চালককে টিপিয়া মারিয়া ফেলিল। বালক চাক্ষুষ এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

একদিন সেই দূত আসিয়া বালকটিকে বলিল, তোমার পিতাকে বলিয়া শীঘ্র আমার মুক্তির বিধান করিতে বল, নতুবা তোমাকেও প্রাণে মারিব। বালক বাড়ীতে ফিরিয়া মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগ্নী বন্ধু প্রভৃতির কাছে এই ঘটনা বিবৃত করিল। মাতা বলিল, বালকের

কথা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে, দেখ না দিন দিন ইহার শরীর কিরূপ ক্ষীণ হইতেছে! সে ক্ষুধা নাই—সে নিদ্রা নাই—সে সোণার-বরণ দেহ নাই—ছেলে আমার যেন দিন দিন কঞ্চির মত হইতেছে।

বালক-জননীর কান্না দেখিয়া তন্মধ্যে একজন প্রতিবেশী বলিল, দেখ তোমার স্বামী এমন পরম বৈষ্ণব, এমন ভক্ত, এমন সাধু, মহাজন! তাঁর পুত্রকে যমের দূত কি করিতে পারিবে? এই বলিয়া সেই প্রতিবেশী শ্রীরঙ্গকে বলিলেন, দেখুন আপনি আপনার পুত্রকে এক গণ্ডূষ পাদোদক প্রদান করুন, যখন যমদূত বালককে শাসাইতে আসিবে, তখন যেন সে সেই পাদোদক যমদূতের গায় ছড়াইয়া দেয়। তাহা হইলেই সে যমদূত মুক্তি লাভ করিবে, বালকও নিরাপদ হইবে।

শ্রীরঙ্গ অগত্যা তাহাই করিলেন। বালক পাদোদক কাছে করিয়া পর্য্যঙ্কে শুইয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরে দূত আসিবামাত্র বালক সেই পাদোদক তাহার অঙ্গে ছড়াইয়া দিল। যমদূত উদ্ধার পাইয়া চলিয়া গেল।

যাঁহারা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বুঝেন তাঁহাদের নিকট এ কথা কিছু নূতন নহে। বৈষ্ণবের যে নিন্দা করে সে মহারৌরব নামক নরকের অধিকারী হয়।

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥"

যে মূর্খগণ বৈষ্ণব মহাত্মাগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণসহ মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়।

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই সম্মান না করে।
আসন হইতে উঠি প্রণয় সাদরে॥
দাম্ভিক সে জন যে নিন্দিত ভ্রষ্টমতি।
অচিরাতে হয় সেই নরকে অতিথি॥

সত্যই তাই। যে খাঁটি বৈষ্ণব, বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণকারী বিষ্ণু পূজারত, তাঁহার পাদোদকে একটি ত দূরের কথা কোটি কোটি ভূত, প্রেত পিশাচে ভব-কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভের অধিকারী

চাঁদরায়।

চাঁদরায় রাজ-মহলের অতি দুর্দ্দান্ত জমিদার। চাঁদরায় বার্ষিক বিশ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর উপস্বত্ব ভোগ করে। কিন্তু নবাব সরকারে এক কপর্দ্দকও রাজস্ব দেয় না। নবাবের সিপাহী শাস্ত্রীরা রাজস্ব লইতে আসিলে চাঁদরায় তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। চাঁদ-রায় দেশে দেশে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়ায়, তার এমনই প্রতাপ—এমনই তেজ—এতই পরাক্রম যে, পথে ঘাটে চাঁদরায়ের ভয়ে কেহ একাকী অগ্রসর হয় না। কাহারও ঘরে সুন্দরী রমণী থাকিলে চাঁদরায় তাহা কাড়িয়া লইয়া আইসে—তাহার ভয়ে কোন সুন্দরী রমণী একাকিনী বাহির হয় না। চাঁদরায় প্রতি বৎসর শরৎ সমাগমে দুর্গোৎসব করে, লক্ষ লক্ষ ছাগ মেষ মহিষ ধরিয়া বলি দেয়, কখন কখন বা ব্রাহ্মণকুমার ধরিয়া তাহাদিগকেই বলি দেয়। এইরূপে চাঁদরায় কত যে পাপ করিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এ সংসারে পাপ কতক্ষণ স্থায়ী হয়? পাপের ফল পাপীকে তিন দিনে—তিন মাসে—না হয় তিন বৎসরে ভোগ করিতেই হয়।

"ত্রিভি র্বর্ষৈ স্ত্রীভি মাসৈ স্ত্রিভিঃ পাক্ষৈ স্ত্রিভি র্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥"

অত্যুৎকট যে পাপ ও পুণ্য তাহার ফল তিন দিনেই হউক, তিন পক্ষেই হৌক, তিন মাসেই হৌক, তিন বৎসরেই হৌক, যখনই হৌক ইহলোকেই ভোগ করিতে হয়।

চাঁদরায়েরও তাহাই হইল। পাপে পাপে সে বায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়িল—উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ তাহার শরীরে দেদীপ্যমান হইল। চাঁদরায় কি যে বলে, কি যে করে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যে চাঁদরায় সর্ব্বদা নানা বিলাস-ব্যসন পরিবৃত হইয়া বাস করিত, বায়ুগ্রস্ত সেই চাঁদরায় আজ এক ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ধূলি-ধূসরিত কলেবরে উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে—চাঁদরায়ের মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই।

চাঁদরায়ের ভাই সন্তোষ অগ্রজের এইরূপ মস্তিষ্কের বিকার দেখিয়া নানা স্নিগ্ধকর তৈল আনিয়া তাঁহার মাথায় প্রয়োগ করিতে লাগিল। ভূতে পাইয়াছে বলিয়া কত শত ওঝা ডাকিয়া ঝাড়া-পোছা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন এক বৈষ্ণব আসিয়া সন্তোষরায়কে বলিল, দেখ যদি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতে পার—শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে যদি প্রবৃত্ত হয় তবে তোমার ভাই রোগমুক্ত হইবে। যতই ওঝা দেখাও—ঔষধ দেও, শ্রীকৃষ্ণের নামগানের ন্যায় ভবব্যাধি নাশের এমন ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই।

রাজ-মহলের নিকট তখন গড়ের হাটে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভু নরোত্তমের মহিমা সন্তোষ রায় জানিতেন। সন্তোষ নানা দ্রব্য সামগ্রী লইয়া দ্রুতগতি নরোত্তমের নিকট গিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সন্তোষের দু'নয়ন দিয়া বর্ষার বারি-

ধারার ন্যায় জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুরের দু'খানি চরণ ধরিয়া সন্তোষ রায় বলিলেন, ঠাকুর আমার—দেবতা আমার—আমার ভাইয়ের প্রতি করুণাবর্ষণ কর। আমরা আর পাপ করিব না, এখন হইতে নিয়মিত শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিব।

প্রভু নরোত্তম আজ মহাবিপদে পড়িলেন। তাঁহার মন হর্ষ ও বিষাদে যুগপৎ পরিপূর্ণ হইল। চাঁদরায়ের ন্যায় মহাপাপী আজ হরি-ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে আনন্দ উপস্থিত হইল। আবার চাঁদরায়ের মত মদ্যপায়ীর বাটীতে তিনি কি প্রকারে যাইবেন ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল। সন্তোষরায় তাঁহাকে তাঁহাদের গৃহে লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রভু নরোত্তম উপায়ান্তর না দেখিয়া রাত্রে গিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় প্রভু নরোত্তম স্বপ্ন দেখিলেন যেন মহাপ্রভু নিজে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, নরোত্তম তুমি চাঁদরায়ের বাটীতে গিয়া তাহাকে সুমতি প্রদান কর।

"পরোপকার করে যে সে হয় উত্তম।
হরিনামে ত্রাণ কর হয় যে অধম॥
অতএব শীঘ্র যাহ ইথি কি বিচার॥
লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ সদাচার॥"

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নরোত্তম সন্তোষের সহিত চাঁদরায়ের বাটীতে গেলেন। ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র পুরনারীগণ তাঁহাকে শঙ্খধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পদার্পণ মাত্রে চাঁদরায় ব্যাধিমুক্ত হইল। সপরিবারে চাঁদরায় ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া কত অনুতাপ ও অনুশোচনা করিতে লাগিল। বলিল ঠাকুর, আমি অতি পাতকী, পাতকী না হইলে কি তোমার এমন রাতুল চরণ ছাড়িয়া আমি নরহত্যা—জীব হত্যায় মজিয়া থাকি।

চাঁদরায়ের অনুতাপ শুনিয়া ঠাকুর নরোত্তমের দয়া হইল। তিনি চাঁদরায়ের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন! তার কর্ণে হরিনাম বর্ষণ করিয়া তাহাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তারপর প্রভু নরোত্তম চাঁদরায়কে বলিলেন :—

"পরের অনিষ্ট কভু কায়মনোবাক্যে।
কোন জীবে নাহি করো কিবা পশু পক্ষে॥
বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে।
ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিন্ধে তাহাও না সহে॥
তেমতিহ জানিবে যে অন্যের শরীরে।
অল্প দুঃখেতে হয় কাতর অন্তরে॥
ধন জন সুহৃদাদি বিয়োগ তেমতি।
আপনার সমান জানিবে অন্য প্রতি॥
প্রাণিবধ পশুহিংসা নির্দ্দয়ের কাজ।
অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ॥
পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল।
কভু নাহি হয়, হয় নরকেতে স্থল॥
আত্যন্তিক শ্রেয়মাত্র হরি-ভক্তি বিনে।
হয় নাহি হবার নহে কভু কোন জনে॥
অতএব পর দুঃখ নিজ দুঃখ মানি।
সবারে করিবে দয়া পুত্রবৎ জানি॥
অধর্ম্মে না কর মতি কায়বাক্য মনে।
সদাচারে বিরোধ অধর্ম্ম আচরণে॥
অন্তর মলিন হয় রজ তম মর্ম্মে।
বুদ্ধি নাশ যার তার ভক্তি কোথা রমে॥

পুণ্য যে বাখানে লোক তাহা না কর্ত্তব্য।
ভক্তি ব্যভিচার হয় অনন্যতা খর্ব্ব ॥
পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠ যথা।
কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে অনন্যথা তথা ॥
ঐকান্তিক নহে শাস্ত্রে কহয়ে বিচিত্র।
অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই হেয় মত ॥"

বাস্তবিকই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-স্মরণ, নাম-কীর্ত্তন করিতে পারিলে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। ভগবানের নাম ও লীলা কীর্ত্তনরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ে অনুরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পাপের নাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর হয়, যে বিষয়-বাসনা মহা দাবাগ্নির ন্যায় মানব-হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে সেই বিষয়-বাসনা নির্ব্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যেমন কুমুদ ফুটিয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয়। ব্রহ্ম-বিদ্যা অসূর্য্যম্পশ্যা বধূর ন্যায়। বধূ যেমন অন্তঃপুরের অন্তঃপুরে অবস্থিতি করেনে, ব্রহ্ম-বিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। গুহ্যাতিগুহ্য শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন সেই ব্রহ্ম বিদ্যার জীবন স্বরূপ। ইহা দ্বারা আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠে, ইহার প্রতি বিন্দুতে পূর্ণামৃতের আস্বাদন; ইহাতেই মানুষ রসে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায়।

চাঁদরায় প্রভু নরোত্তমের কাছে এই ভক্তি রসের আস্বাদন পাইলেন। চাঁদরায় শ্রীল নরোত্তমের কাছে শিখিলেন, কলির জীবের হরিনাম

কীর্ত্তন ছাড়া মোক্ষলাভের আর উপায় নাই। চাঁদরায় তাই শ্রীল নরোত্তমের পায়ে পড়িয়া বলিল :—

"এক কৃষ্ণ ভক্তি বিনে সকলি অনর্থ।
এবে বুঝিলাম প্রভু যত সব ব্যর্থ॥
হেন মহা-পাপী মুই মূঢ় দুরাচার।
হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম্ম তোমার॥"

তখন চাঁদরায়ের ভ্রাতা সন্তোষ রায়, এবং সংসারের, বৃদ্ধ হইতে শিশু পর্য্যন্ত সকলে প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। প্রভু নরোত্তম বিদায় হইলেন। যাইবার কালে চাঁদরায়কে বলিয়া গেলেন, দেখ বাবু, "কখনও দেবস্ব, ব্রহ্মস্ব আর রাজস্ব হরণ করিও না।" চাঁদরায় নতমস্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল। অতঃপর প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া বহু অর্থ অলঙ্কার দিয়া চাঁদরায় তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সন্তোষ রায় নিজে বহু লোকজন সহ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন।

শ্রীবিঠ্ঠল দাস

শ্রীবিঠ্ঠল দাসের বাটী মথুরায়। তিনি রাজার পুরোহিত—শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। বিঠ্ঠল দাস সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নীরবে অবস্থান করেন। রাজা তাহা শুনিয়া বিঠ্ঠল দাসকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজার আহ্বানে বিঠ্ঠল দাস রাজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন একাদশী—রাজার সহিত বিঠ্ঠল দাসের সাক্ষাৎ হইল। রাজার চারিপার্শ্বে বহু বৈষ্ণব

বসিয়া আছেন, রাজা বৈষ্ণবদের গান শুনিতেছেন। বিঠ্ঠল দাস সেখানে যাইবামাত্র একেবারে তন্ময় হইয়া বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন। অনেক রাত্রে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি উঠিয়া গানের তালে তালে নাচিতে লাগিলেন। কোথায় কাহার ঘাড়ে পা দিতেছেন, উলঙ্গ কি বহির্ব্বাস আছে, বিঠ্ঠল দাসের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। বৈষ্ণবেরা গান গাহিতেছে, সেই গানের তালে তালে বিঠ্ঠল দাস আপন হারা হইয়া নাচিতেছেন। জ্ঞান নাই—চৈতন্য নাই—সংজ্ঞা নাই। ভগবানের জন্য ভক্তের বুঝি এমনই ধারা আকুলতা হয়!

ছাদের উপর রাজা বসিয়াছিলেন, বৈষ্ণবেরা ছাদের উপরেই গান করিতেছিলেন। বিঠ্ঠল দাস ছাদের উপরই নাচিতেছিলেন। হঠাৎ নাচিতে নাচিতে তিনি ছাদ হইতে পড়িয়া গেলেন। রাজা ও বৈষ্ণবগণ সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ধর ধর বলিয়া রাজা অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন, কৃষ্ণের এমনই অপার করুণা যে বিঠ্ঠল দাসের গায়ে একটুও আঘাত লাগিল না। তুলাশয্যার উপরে কেহ পড়িয়া গেলে যেমন তাহার গায়ে একটুও আঁচড় লাগে না, তেমনি বিঠ্ঠল দাসের অঙ্গে একটুও আঘাত লাগিল না। ছাদের উপর হইতে সকলে কিন্তু মনে করিল বিঠ্ঠল দাসের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, বিঠ্ঠল দাস আর ইহজগতে নাই। সকলে নীচে আসিয়া দেখিল যেমন বিঠ্ঠল দাস তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। রাজা বিঠ্ঠল দাসের ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা বুঝিলেন এ ব্যক্তি নিতান্ত সামান্য নহেন। বাড়ীতে গিয়া বিঠ্ঠল দাস ঘর-সংসার করিতে ও ভগবানের নাম গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। বিঠ্ঠল দাস এই পুত্রের নাম রঙ্গি রায় রাখিলেন। রঙ্গি রায়ের বয়স যখন অষ্টাদশ বর্ষ হইল, তখন

একদিন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কিছু টাকাকড়ি ও অতি সুগঠন একটি শ্রীবিগ্রহ পাইলেন। পিতাপুত্রে দুই জনে মিলিয়া সেই বিগ্রহের পূজা করিতে লাগিলেন। উভয়ে দিন রাত সেই বিগ্রহ লইয়া পরমানন্দে এবং উল্লাসে কাটাইতে লাগিলেন। রাজার কন্যা রঙ্গি রায়ের ভগবৎ প্রেম দেখিয়া তাহার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। রাজকন্যা রঙ্গি রায়ের নিকট কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। একদিন বিঠ্ঠলের গৃহে এক নর্ত্তকী আসিয়া গান করিতে লাগিল, সে মধুর-স্বরে রাস-লীলা এমনভাবে গান করিতে লাগিল যে, বিঠঠল আর প্রাণের আবেগ সংবরণ করিতে পারিল না। তাঁহার ঘরে অলঙ্কার ও বস্ত্র যাহা ছিল তৎ সমস্ত আনিয়া নর্ত্তকীকে প্রদান করিতে লাগিল। টাকা-কড়ি বসন-ভূষণ যেখানে যত ছিল, বিঠ্ঠল দাস একে একে নর্ত্তকীকে সমস্তপ্রদান করিলেন। তারপর যখন দান করিবার উপযোগী ঘরে আঁর কিছুই রহিল না, তখন বিঠ্ঠল দাস নিজ পুত্রের হস্ত ধরিয়া আনিয়া নর্ত্তকীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

গান শেষ হইয়া গেলে নর্ত্তকী রঙ্গি রায়ের হাত ধরিয়া নিজের বাটীতে লইয়া যাইতে লাগিল। বিঠ্ঠল দাস বলিলেন, নর্ত্তকী তুমি আমার পুত্রটিকে লইও না, ইহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে বহু টাকা প্রদান করিতেছি। রঙ্গি রায় বলিল, পিতা, এ তোমার কিরূপ কথা? কৃষ্ণ কথা শুনিতে শুনিতে তুমি তন্ময় হইয়া আমাকে দান করিয়াছ। দান করিয়া আবার তাহাকে গ্রহণ করিবে কিরূপে? বিঠ্ঠল পুত্রের কথা শুনিয়া একেবারে লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এদিকে নর্ত্তকী রঙ্গি রায়ের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাজকুমারী এই সংবাদ পাইয়া আসিয়া নর্ত্তকীকে বলিল, দেখ এই

রঙ্গি রায় আমার গুরু, আমি ইঁহাকে ভিক্ষা চাহিতেছি, ইঁহাকে ভিক্ষা দাও।

নর্ত্তকী বলিল, রাজপুত্রী, আমি ইঁহাকে তোমায় দিতে পারি, যদি এই রঙ্গি রায়ের ওজনের সম-পরিমাণ স্বর্ণ আমায় দাও।

রাজকন্যা তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, নর্ত্তকী তুমি কি বলিতেছ? স্বর্ণ ত অতি তুচ্ছ কথা! যদি আমার সর্ব্বস্ব—এমন কি এই প্রাণ পর্য্যন্ত চাও তবে তাহাও দিতে প্রস্তুত।

নর্ত্তকী রাজকন্যার গভীর গুরুভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। নর্ত্তকী রাজকন্যার হস্তে রঙ্গি রায়কে সমর্পণ করিয়া নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল। রাজকন্যা কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি নিজের অঙ্গ হইতে নানা অলঙ্কার খুলিয়া নর্ত্তকীকে প্রদান করিলেন।

রাজকুমারী গুরুকে লইয়া নিজের বাড়ীতে গেলেন। প্রাণধনকে কাহারও হাতে দিতে সাহস হইল না—এমন কি নিজের পিতার কাছে পর্য্যন্ত রঙ্গি রায়ের কথা বলিলেন না। কি জানি, পিতা যদি তাঁহার প্রাণধনকে অন্য কাহারও হস্তে প্রদান করেন!

রাজকুমারী অতি সযত্নে রঙ্গি রায়কে লইয়া একটি মন্দিরে তাঁহাকে স্থাপন করতঃ ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার পাদসেবন ও পূজা, গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী, রাজ-প্রজা সকলেই রাজকুমারীর বৈষ্ণব-ভক্তি দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইল।

এ সংসারে গুরু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। গুরুরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবন করিতে পারিলেই মুমুক্ষু ভক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ পায়। যে গুরু ছাড়িয়া গোবিন্দের পূজা করে তার সমস্ত পূজার্চ্চনাই ব্যর্থ হয়। গুরু ছাড়া গোবিন্দ নাই, আবার গোবিন্দ ছাড়া গুরু নাই! গোবিন্দকে লাভ করিতে গেলে গুরুর চরণসেবা করিয়া তবে তার অধিকারী

হইতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা যেমন প্রথমে বর্ণ-পরিচয়ের আবশ্যক, ধর্ম্ম শিক্ষার্থ তেমনি প্রথমে ধর্ম্ম-জ্ঞানের বর্ণ-পরিচয় আবশ্যক। সেই বর্ণ-পরিচয় দেবদেবীর পূজার ব্রতানুষ্ঠান এবং প্রবৃত্তি পথের নানা ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রথমে আরম্ভ করিতে হয়। আরব্ধ করাইবার নিমিত্ত হিন্দু সমাজে ধর্ম্মশিক্ষার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুরু নির্দ্দিষ্ট আছেন। কারণ গুরু ভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যেমন বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রথমে পাঠশালায় হাতে খড়ী হয়, তারপর সামান্য গুরুর নিকট পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ ধর্ম্ম শিক্ষার্থ প্রথমে পাঠশালায় হাতে খড়ি হয়, তারপর সামান্য গুরুর নিকট পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়, সেই ধর্ম্মশিক্ষার্থ প্রথমে গুরুর নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজাপদ্ধতি আরম্ভ করিতে হয়। এই পূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের শিক্ষা এই যে, কর্ম্মফল সমস্তই ভগবানে অর্পণ কর।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি তান্ত্রিক সকলেই নিজ নিজ গুরুর আশ্রয় লইয়া তবে ধর্ম্মজীবন গঠন করেন। পরিশুদ্ধ হইতে না পারিলে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উচ্চাদর্শে উঠা যায় না। উচ্চাদর্শে উঠিলে তবে ধর্ম্মপথের উচ্চশিখরে পঁহুছিতে পারা যায়। উচ্চশিখরে উপস্থিত হইলে হিন্দুধর্ম্মের পরম নিবৃত্তি—সন্ন্যাস ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সন্ন্যাসধর্ম্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। এখানে সকল সম্প্রদায় এক হইয়া যান। এই সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্রহ্ম-তন্ময়তা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সেই ব্রহ্ম-তন্ময়তায় ব্রহ্মময় বিশ্বের পূজা ও প্রেম—সেই বিশ্বপ্রেমে সমদর্শিতা হয়। সেই সমদর্শিতায় বিশ্ব ও ব্রহ্ম একই বস্তু।

শ্রীগদাধর ভট্ট।

গদাধর ভট্ট ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পরম রসিক ভক্ত। সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলা-রসে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটী পদ রচনা করিয়া তাহা বৃন্দাবন ধামে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইলেন। গোস্বামীজি সেই পদ পাইয়া গদাধর ভট্টকে একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তোমার পদ এমন সুমিষ্ট ও সুন্দর যে বৃন্দাবনবাসী সেই পদ শুনিতে শুনিতে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়।

শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র পাইয়া ভট্টজী তাহা—একবার মাথায় রাখেন আর একবার ভক্তিভরে প্রণাম করেন। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া বৃন্দাবন ধামে যাইয়া শ্রীজীব গোস্বামীর পদতলে পড়িলেন। গোস্বামীজি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া পরস্পর প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন। ভট্টজী শ্রীজীবকে বলিলেন, দেখুন রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব শুনিতে আমার বড় অভিলাষ, আমাকে সেই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব রসলীলা কিছু বলুন।

তখন শ্রীজীব গোস্বামী গদাধরকে যে রাধাকৃষ্ণ রস প্রকরণ বলিয়াছিলেন তাহাই "কর্ণ-রসায়ন" নামক গ্রন্থ বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীজীব বলিলেন, দেখ গৌণ মুখ্য দুই ভেদে রস দ্বাদশ প্রকার। তার মধ্যে পাঁচটি মুখ্য রস, আর সাতটি গৌণ রস। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, এই সাতটী গৌণ রস। এই গুলিকে অভদ্র রস বলিলেও পাত্র বিশেষে ইহারা চমৎকার রস হয়। আর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পাঁচটী মুখ্য রস। এই পাঁচটী রসের

মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রধান। কিন্তু এ সকলের মধ্যে সকলের চেয়ে মধুর রসই প্রধান। এই সমস্ত রসের পরিপূর্ণ লক্ষণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আমরা দেখিতে পাই। ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামে যত রস আছে শ্রীকৃষ্ণ সে সমস্ত রসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যখন ব্রজে ছিলেন তখন ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীর শান্ত, ধীর ললিত এই চারি প্রকার রসের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমে বিনয়, মৃদুত্ব, গভীর করুণা, নির্দ্দান্তিক শীলযুক্ততার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদাত্ত লক্ষণের পরিচয় দিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সমান ভাব প্রকাশ করিয়া ও পরকে আপন বলিয়া ভাবিয়া এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তিনি ধীরোশান্ত রসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তারপর অহঙ্কার, মৎসর, কপটতা, ক্রোধ প্রকৃতি দেখাইয়া তিনি ধীরোদ্ধত লক্ষণের পরিচয় দেন।

অন্য একজনের প্রতি যে প্রবল অনুরাগ তাহাকে অনুকূল লক্ষণ কহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনেক গোপিকা কান্তাসক্তিতে আসক্ত ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সবার চেয়ে শ্রীরাধার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। যথা—

গোকুল নগরে, অনেক রূপসী,
আছয়ে নব যৌবনী।
কেলিকা রসে, রূপে গুণে ধনী,
তোমা সম নাহি গণি॥
যেহেতু নাগর, সে সব নাগরী;
হেরিয়া নাহিক ভুলে।
ফিরে নাহি চায়, তোমারে চিন্তায়,
কর দিয়া শ্রুতি মূলে॥
কি গুণে বেন্ধেছ, কি গুণ করেছ,
কি রসেতে ভুলায়েছ।

তোমা বিনে নাহি, জানে দিবানিশি,
কি ভাগ্য তুমি করেছ ॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই যে অত্যন্তাসক্তি ইহাই অনুকূল লক্ষণের পরিচায়ক।

আবার শঠের লক্ষণও শ্রীকৃষ্ণে দেদীপ্যমান আছে। সে কিরূপ তাহা বলিতেছি :—

একদিন নিশিযোগে, শ্রীরাধার অনুরাগে,
কৃষ্ণচন্দ্র করি অভিসার।
যাইতে কুঞ্জ বিপিনে, চন্দ্রাবলী সখীসনে,
দেখা হৈল পথের মাঝার ॥
হাসিয়া কহয়ে সখী, বড় যে কৌতুক দেখি,
এনাবেশে গমন কোথারে।
কোন রমণী প্রেমে, বাধিত হৈয়াছ কামে,
দ্রুতগতি যাইছ তথারে ॥
যাইতে নারিবে তথা, পাও পাবে মনে ব্যথা,
আজি তোমায় না দিব ছাড়িয়া।
মো-সবার প্রিয়সখী, চন্দ্রাবলী বিধুমুখী,
তোমায় যাব তাহাই লইয়া ॥
এত কহি মৃচকিয়া, বসন ধরিলা পিয়া,
কৃষ্ণ কিছু কহয়ে চাতুরী।
আমি ত তাহাই চাই, চন্দ্রাবলী স্থানে যাই,
কিন্তু মুই আসি শীঘ্র করি ॥
সখী কহে তা না হবে, কি কাজে কোথায় যাবে,
বল আমি যাইয়া করিব।

যেথানে যে কাজে কবে, তখনি করিব সবে,
যাহা চাহ তাহা আনি দিব ॥
কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে, চাতুরী ত না লাগিবে,
নিশ্চয় যে যাইতে হইল ।
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলক ভাবে,
তবে সখা শীঘ্র করি চল ॥
চন্দ্রাবলী চন্দ্রানন, সুধা আশে মোর মন,
চকোর পিয়াসে উৎকণ্ঠিত ।
মিলাইয়া তাহা সনে, অমিয়ায় সিঞ্চনে,
প্রাণ দান দিয়া কর হিত ॥
তবে চন্দ্রাবলী স্থানে, লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সনে,
মিলাইলা শব্যা আদি সখী ।
চন্দ্রাবলী বিধুমুখী, আনন্দে পরম সুখী,
প্রাণ দান বদন নিরখি ॥
কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী প্রতি, প্রিয় বাক্য নানা ভাতি,
কহে কিন্তু মন রাধিকাতে ।
কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধনি,
তোমা সম না দেখি জগতে ॥
বি-দগ্ধার শিরোমণি, প্রেমরসে রসখনি,
রসময়ী সু-রমণীমণি ।
যতেক প্রেয়সী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা,
তোমা বিনে আর নাহি জানি ।
বিনয় পূর্ব্বক বহু রজনী বঞ্চিয়া,
প্রভাতে শ্রীরাধা স্থানে আসি দেখা দিয়া,

চন্দ্রাবলীর নিন্দা কয়ে ভঙ্গি করি।
শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচারি ॥

ইহাই শঠের লক্ষণ। পূর্ণমাত্রায় এই শঠের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে পাওয়া যায়।

গদাধর ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা গোস্বামীজি এইবার মুগ্ধার লক্ষণ কিরূপ তাহা বর্ণনা করুন।

শ্রীজীব বলিলেন, নবীন বয়সে হৃদয়ে নব-মন্মথের উদয় হইয়াছে, রতি-ক্রিয়ায় অতিশয় ইচ্ছুকা অথচ লজ্জায় তাহা বলিতে পারে না। অন্তরে অদম্য বাসনা, অথচ প্রণয়ী অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র তাহা ঠেলিয়া ফেলে, প্রণয়ীর প্রতি মান করিয়া কেবল ক্রন্দন করে, প্রণয়ী মিষ্ট কথা বলিলে মান দূরে যায়, অতি প্রফুল্লিতা হয়, নানারূপ ছল-ছুতা করিয়া সে প্রণয়ীকে দেখে, কিন্তু প্রণয়ীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ভয় হয়, তাহাকে মুগ্ধা বলে। শ্রীকৃষ্ণ এই মুগ্ধা সঙ্গরসে একেবারে মজ্‌গুল।

গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা প্রগল্‌ভতা লক্ষণ কিরূপ?

শ্রীজীব বলিলেন, দেখ প্রগল্‌ভতা রসের পূর্ণ লক্ষণ শ্রীরাধিকায়। প্রিয়ের সহিত কৌতুক ও সদা হাস্য পরিহাস করা, হৃদয়ে হৃদয় মিলিত করিয়া সর্ব্বদা রঙ্গ রস কেলি করা, ঘন ঘন প্রিয়পাত্রের মুখের দিকে চাওয়া, প্রিয়ের যাহাতে মনে আনন্দ হয় সে জন্য নির্লজ্জের মত নানাভাব প্রদর্শন করা প্রগল্‌ভতা রসের লক্ষণ।

শ্রীজীব বলেন, এইবার তোমাকে আরও নানা রসের কথা বলিতেছি। প্রিয় দূর দেশে গেলে যে নারী বিরহিণী হইয়া মলিনবেশে থাকে, কেশ বাঁধে না, সর্ব্বদা চিন্তায় আকুলা থাকে, রাত্রি দিন হা-হুতাশ করে তাহাকে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা রস বলে। এই রসের পূর্ণ পরিচয় শ্রীরাধায় পাওয়া যায়। হরি মথুরাপুরী গিয়াছেন, কাল আসিবেন বলিয়া প্রবোধ

দিয়া গিয়াছেন, শ্রীরাধার আর শান্তি নাই। চন্দ্রের কিরণ আজ বিষসম জ্ঞান হইতেছে, কোকিলের ধ্বনি আজ বুকে শেল বিদ্ধ করিতেছে, যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমরা বলিতে পার আমার প্রাণবল্লভ যে কাল আসিব বলিয়া গেলেন সে কালের আর কত কাল বাকি আছে? বলিতে পার কোথায় গেলে আমার প্রাণ-নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে? শ্রীরাধা এইরূপ প্রোষিত ভর্তৃকা রসের পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন।

এই প্রোষিত ভর্তৃকা আবার অনেক রকম। যাহারা অতি অনুরাগে লাজ লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রিয়সনে মিলিবার জন্য নিজেই যাইয়া প্রিয়ের সহিত মিলিত হয় তাহাকে "স্বয়ং দূতী" বলে।

আবার কেহ কেহ মুখে হাত দিয়া অঙ্গুলির ধ্বনি করে, সখীর সঙ্গে অন্য মনে ভুলবাক্য কহিতে থাকে, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ধরণী খোঁড়ে, কর্ণ কণ্ডুয়ন করিতে করিতে স্তন প্রদর্শন করে, কখনও সখীর কণ্ঠ ধরিয়া আলিঙ্গন করে, কখনও বা কণ্ঠ ছাড়িয়া তাহাকে ভর্ৎসনা ও তাড়না করে, চঞ্চল-নয়নে এদিকে ওদিকে তাকায়, স্তব্ধ প্রায় থাকিয়া অকারণ বাক্য কহিতে থাকে, মিছামিছি কথা বলিতে থাকে, এই সমস্ত আঙ্গিক রসের লক্ষণ। আবার শুন, ঈষৎ নয়নে দেখিয়া যাহারা মুখ ফিরায়, হাসি হাসি চাহি পুনঃ নয়ন ঢুলাইতে থাকে, মুদ্রিত নয়নে পুনরায় আধ আধ দেখিয়া বামচক্ষু প্রসারিত করিয়া কটাক্ষ করে তাহাকে চাক্ষুস রস বলে। যে রসে গর্ব্ব অভিলাষ আর ঈষৎ রোদন প্রকাশ পায়, কিঞ্চিৎ হাস্যের সহিত কোপন অসূয়া প্রকাশ পায় তাহাকে কিলকিঞ্চিত রস বলে। এই কিলকিঞ্চিত রসটি শ্রীরাধায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল :—

একদিন প্যারী, রাধিকা সুন্দরী,

যমুনা সিনানে যায়।

পথের মাঝারে,   নাগর হইয়া,
বাহু পাসরিয়া ধায় ॥
চুম্বন করিয়া,   কুচে কর দিয়া,
ধনী মুখ অঙ্গ মোড়ি।
যাও যাও করি,   করে কর ঠেলি,
ঝমকে কঙ্কণ চুড়ি ॥
নয়নে ভ্রূকুটি,   করিয়া চাহয়ে,
রোদনের সহ হাস।
গর্ব্বে অভিলাষ,   অঙ্গ যে করিয়া,
সাত মত পরকাশ ॥
তাহা ত হেরিয়া,   রসিক নাগর,
ভাসায়ে সুখ সাগরে।
অঙ্গ পুলকিত,   সখীর সহিত,
তাহার বাখান করে ॥

প্রিয়কে স্মরণ করিয়া সেই ভাবে ভাবান্বিতা হইয়া তাঁহার সহিত মিলনের যে অভিলাষ তাহাকে মোট্টায়িত রস বলে। ইহার লক্ষণও শ্রীরাধায় দেদীপ্যমান।—

প্রিয়ের মিলন,   লাগিয়া সুন্দরী,
রস অভিলাষে ভরি।
সময় নিরখে,   উৎকণ্ঠা হইয়া,
সখীর বদন হেরি ॥
খেনে খেনে ধনি,   ঝমকি উঠিয়া,
বাহির যাইয়া দেখে।

ক্ষণেক পিয়ার, সহিত বিহারি,
মনোরথ করি থাকে ॥
খেলে অঙ্গ মুড়ি, আলিঁস তেজয়ে,
পড়য়ে সখীর কোলে।
নিয়া যাও সখি, প্রাণনাথ যথা—
আমার সদাই বলে ॥

অতঃপর ললিত রস কাহাকে বলে তাহা বলি। প্রিয়সনে সন্দর্শনে যে অঙ্গ ভঙ্গিমা তাহাকে ললিত রস কহে। যে নারী প্রিয়সনে দর্শন হইতে হঠাৎ সুভঙ্গি করিয়া দণ্ডায়মান হয়, ঘোম্‌টা টানিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া প্রিয়ার পানে ঈষৎ হাসিয়া চাহে, বামপদে অঙ্গভার অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়, যাহার অঙ্গের সুগন্ধে অলিকুল তাহার দিকে ধাবিত হয়, তাহাকে ললিত রস বলে।

অতঃপর প্রেমের লক্ষণ বলিতেছি শুন। অনেক বিপদে যার মন কিঞ্চিৎ টলে না, তাহাকে প্রেমের লক্ষণ বলে। সেই প্রেম যখন হৃদয়ে পরিপাক হইয়া যায় তখন তাহা "স্নেহ" রূপে পরিণত হয়। স্নেহের পরিণামে মান হয়। মান পরিপাক হইলে বিশ্বাস ও মিত্রতা হয়। ইহারই নাম প্রণয়। প্রণয়ের পরিপাক হইলেই রাগের উৎপত্তি হয়। বহু প্রকার দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করা, বিপদেও মন কিছুতে টলে না, তাহাকে রাগ বলে। রাগ হইতে আবার অনুরাগের উৎপত্তি হয়। প্রিয়ের মুখকমল যখনই দেখে তখনই তাহা নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়, অনুরাগের ইহাই লক্ষণ। যতবার দেখে ততবারই আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়—দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়া মনে উপস্থিত হয়—দেখার সাধ আর কিছুতেই মিটে না। শ্রীরাধিকায় এই অনুরাগের লক্ষণটি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত :—

একতিল প্রিয়, বদন মাধুরী,
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হেরিয়াও মোর, না পূরয়ে আশা,
বাসনা নয়ানে ভরি॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নূতন যে হেরি,
যেন কভু দেখি নাই।
কি দিয়া বান্ধিল, পরাণ আমার,
ভাবিয়া কিছু না পাই॥
যে দিকে নিরখি, শ্যামল সুন্দর,
মোহন মাধুরী দেখি।
শ্যাম বহি আর, কিছু দেখি নাই,
এ কি জ্বালা হ'ল সখি॥

কাহারও রূপ দর্শন, রূপ গুণের কথা শ্রবণ অথবা কাহারও চিত্রপট দর্শনে যে রাগের উৎপত্তি হয় তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। এই পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল—শ্রীরাধায়। শ্রীরাধা যমুনার জলে জল আনিতে যাইতেছেন, কদম্বের তলে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠাম কানু দাঁড়াইয়া। আর কি রক্ষা আছে ? বাড়ী গিয়া সুন্দরী স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে সখীকে বলিলেন, সখি! যমুনার তীরে কাহাকে দেখিলাম। প্রাণ, মন, দেহ, আমি তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়াছি। সখিরে তাহাকে না দেখিলে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার মত হয়! বুঝি আমার ধর্ম্ম-কুল-শীল সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণের মূর্ত্তি চিত্রপটে লিখিয়া সখি বিশাখা যখন শ্রীরাধাকে আনিয়া দেখাইলেন, রাই তাহা দেখিয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, মাটীতে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা প্রাতে উঠিয়াই সখির গলা ধরিয়া বলিতেছেন, সখিরে! আজ রাত্রে বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম যেন জলধর তনু এক অপরূপ রূপ—এমন রূপ যেন তার প্রতি অঙ্গ দিয়া অনঙ্গ ছুটিয়া পড়িতেছে, আসিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত। সখিরে সেই কিশোরকে দেখিতে আমার লালসা জন্মিতেছে।

সখামুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ শুনিয়া শ্রীরাধা একেবারে ধূলায় লুণ্ঠন করিতেছেন। শ্রীরাধার উপরোক্ত লক্ষণগুলি পূর্ব্বরাগের লক্ষণ।

প্রিয়ের নিকটে প্রেমময়ী ধনি বসিয়া প্রেমের বিহ্বলে চারিদিকে তাকাইয়া কাঁদিতে থাকে, ইহাকে প্রেম-বৈচিত্র্য রস বলে। এই ভাবটি শ্রীরাধায় দেদীপ্যমান :—

শ্যামেরে নিকটে বসি, রঙ্গ-রসে হাসি হাসি,
বিবিধ কৌতুকে শশীমুখী।
বিহরয় প্রিয়সনে, চারুপাশে সখিগণে,
আনন্দিত সে কৌতুক দেখি॥
হেনই সময় চিতে, প্রেম উদ্দীপন রীতে,
প্রিয়ের বিচ্ছেদ-স্ফূর্ত্তি ভাবে।
কান্দিয়া সখির স্থানে, কহয়ে কাতর মনে,
বিরহ উৎকণ্ঠা মৃদুরবে॥
কহ সখি প্রিয় কোথা, আমার অন্তর ব্যথা,
ঘুচাও আনিয়া মিলাইয়া।
নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ দুখে করহ ত্রাণ,
নহে চল আমারে লইয়া॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, হাস্য মুখে মন্দ মন্দ,
নিরখয়ে প্রফুল্ল বদনে।

সখীগণ চারিপাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কহে কিছু মধুর বচনে॥
কহ সখি কি কারণে, বিরহিণী হৈলে কেনে,
প্রিয়ে তব গেল কোথা কারে।
কেহ ইহ শ্যামল শশী, তোমার দক্ষিণে বসি,
রসের মাধুরী তব হেরে॥
নয়ান পসারি চাহ, এই তব প্রিয়ে লহ,
তেজ সখি বিরহ বেদনা।
তাহা শুনি সুধামুখী, চেতন পাইয়া আঁখি,
কুঞ্চিত করিয়া সুবদনা।
লজ্জিত সহাস্য মুখে, তর্জ্জনী অর্পিয়া নাকে,
যৎ-কিঞ্চিৎ টানিয়া ঘোমটা।
হেট বদনেতে রহে, সখীর পানেতে চাহে,
হেরি হরি সে ভাবের ছটা॥
পরম আনন্দ মনে, ধরি প্যারি চন্দ্রাননে,
চুম্বন করয়ে ঘনে ঘন।
পুনঃপুন আলিঙ্গন, অশ্রু নয়ানে বয়,
এই প্রেম বৈচিত্র্য লক্ষণ॥

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মরণ, প্রেমে এই দশ দশা উপস্থিত হয়। প্রেমিকাকে দর্শন, আলিঙ্গন আর চুম্বন করিয়া তাহাতে যে সুখ উপস্থিত হয় তাহাকে সম্ভোগ লক্ষণ বলে। সম্ভোগ লক্ষণ দুই প্রকার, এক মুখ্য ও অন্য চেতন। স্বপ্নে প্রেমিক-প্রেমিকা যে সম্ভোগ সুখ উপভোগ করে তাহাকে গৌণ সম্ভোগ বলে। এই গৌণ সম্ভোগের লক্ষণ শ্রীরাধায় দেদীপ্যমান্ :—

আজি সখি মোর, হিয়ার আনন্দ,
কিছু যে কহিব তোরে।
স্বপ্নে দেখিনু, প্রিয়তম আসি,
বসিয়া মোর শিয়রে॥
বদন চুম্বন, করয়ে আমার,
মুচকি মুচকি হাসি।
নাসায় মুকুতা, নোলক দুলিছে,
তাহে শোভে মুখশশী॥
উরজে কমল, করযুগ দিতে,
বাহু পাসরিয়া তারে।
ধরিতে চাহিনু, করে না পাইনু,
ছুটিয়া পলাইল দূরে॥
ঘুমের ঘোরেতে, শয্যায় হাতাড়ি,
এ পাশ ও পাশ করি॥
না পাইয়া বন্ধু, ক্ষোভিত হইনু,
নয়ানে ঝরয়ে বারি॥
তখন বুঝিনু, স্বপন দেখিনু,
চেতন পাইয়া মনে।
উঠিয়া বসিয়া, স্থির কৈনু হিয়া,
কৃষ্ণদাস রসে ভণে॥

শ্রীজীব গোস্বামী গদাধর ভট্টকে এই প্রকারে সংক্ষেপে রসতত্ত্ব বলিয়া কহিলেন, রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত কেহ এই রসের পরিপূর্ণতা দেখাইতে পারিবে না। কখনও মূঢ় কামুকের নিকট এই রসের কথা বলিবে না। অধিকারী না হইলে কেহ এই লীলারস উপলব্ধি

করিতে পারিবে না—পারে না। ভট্টজী ইহা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

ধোর গ্রামে তখন কল্যাণসিংহ নামে এক অতি পরম কৃষ্ণ-ভক্ত শুদ্ধমতি লোক ছিলেন। ভট্টজীউ কৌতুক দেখিতে তথায় নিজে গেলেন। ভট্টজীউর মুখে রসতত্ত্ব শুনিয়া কল্যাণসিংহের মন গলিয়া গেল। তিনি ভট্টজীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিলেন। কল্যাণসিংহের স্ত্রী ভট্টজীর কাছে আসিয়া বলিল, স্বামী আমার উদাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, আমাকে লালন-পালন করিবে কে?

ভট্টজী বলিলেন, তুমি অতি মূর্খ নারী! তোমার স্বামী যে কে তাহা তুমি এখনও জানিতে পারিতেছ না। যিনি জগতের স্বামী সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিত্য স্বামী। সেই নিত্য স্বামীর ভজনা কর, তিনিই তোমাকে লালন-পালন করিবেন। জগতের স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া যে নারী অন্য স্বামীর সেবা করে সে ত ভ্রষ্টা নারী!

কল্যাণসিংহের স্ত্রী ভট্টজীর এ কথা শুনিয়া একটুও আনন্দিত হইল না। সে স্বামীকে বশ করিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত এক যাদুকরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাদুকর কল্যাণসিংহের নিকট গিয়া তাহাকে তন্ত্র-মন্ত্র জপিয়া কত ছিটে ফোঁটা দিল! কিন্তু হায় রে হায়! যাহার মন কৃষ্ণপ্রেমরসে ডুবিয়াছে তাহাকে কি আর যাদুকরের তন্ত্রে-মন্ত্রে ভুলাইতে পারে? মত্তহস্তীকে ঘরে বশ করিয়া রাখে জগতে এমন কে আছে? জগৎ যে শ্রীকৃষ্ণের বশ—সেই কৃষ্ণ ভক্তকে বশ করিতে পারে জগতে এমন সাধ্য বা কাহার আছে?

প্রতিদিন ভট্টজীর কাছে গ্রন্থপাঠ শুনিবার জন্য তাঁহার চারিদিকে বহু লোকজন বসে। ভট্টজী গ্রন্থপাঠ করেন, তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণের দেহ পুলকিত হয়; কিন্তু একজন লোকের দেহে কোন প্রকার পুলকের

লক্ষণ দেখা যায় না। সে ব্যক্তি মনে মনে এক ফন্দী আঁটিল। গোপনে সে নিজের কাছে কিছু লঙ্কা রাখিয়া দিল। যে সময় ভট্টজী গ্রন্থপাঠ করিতেন সে সময় সে এক মুঠা লঙ্কা লইয়া অন্যের অগোচরে তাহা চক্ষে ঘসিয়া দিত। একদিন, দু'দিন করিয়া কয়েকদিন গেল। একদিন একজন ভক্ত তাহা দেখিতে পাইয়া ভট্টজীর কাছে তাহা বলিল। ভট্টজী তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, লোকটি ভাল কাজই করিয়াছে, কৃষ্ণকথা শুনিয়া যাহার চক্ষে জল ঝরে না তাহার চক্ষে লঙ্কা মরিচ ঘসিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ভট্টজী যে কত গুণের আধার ছিলেন তাহা ভাষায় বলা যায় না, নির্ম্মৎসর, লাভালাভে তিনি সমান হৃদয় ছিলেন। তাঁহার ঘরে চোর প্রবেশ করিয়া সিঁদ্ কাটিয়া দ্রব্য-সামগ্রী চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, দ্রব্য-সামগ্রী অত্যন্ত ভারি, এত ভারি যে সে তাহা উঠাইতে পারিতেছেনা, তাহা দেখিয়া ভট্টজীর প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল, ভট্টজী মোটটি মাথায় তুলিয়া দিবার নিমিত্ত চোরের নিকট অগ্রসর হইলেন। ভট্টজীকে দেখিয়া চোর মোট ফেলিয়া পলাইবার উপক্রম করিল, ভট্টজী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে কিছুই বলিব না। চোর ভট্টজীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল। ভট্টজীর কথায় সে মোট লইয়া ঘরে গেল। কিন্তু কিছুতেই তাহার মনে শান্তি আসিল না। সে পরদিন আবার সেই মোট লইয়া ভট্টজীর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। ভট্টজী তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করিয়া শিষ্য করিয়া লইলেন। ভট্টজীর সংস্পর্শে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইল।

একদিন একজন ধনী ভট্টজীর শিষ্য হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিল। ভট্টজী তাহাকে শিষ্য করিবেন না বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। কেন করিলেন? ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব দ্বারা ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না!

শ্রীচৈতন্যের পারিষদগণ।

দ্বাপরে যে শ্রীকৃষ্ণ রাধাসনে প্রেম-মাধুরী আস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই সুখ আরও আস্বাদন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবার নিজেই রাধাভাব লইয়া গৌড়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবার কালবর্ণ তাঁহার গৌরবর্ণ হইয়াছে। গোপীরা এবার সব গোরার স্থান অধিকার করিয়াছে, সে রূপ যে একবার চোখে দেখে সে তাহা ভুলিতে পারে না। এবার নদীয়ায় আসিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমামৃত পানে লোক উদ্ধার পাইল, রোগ-শোক দূরে গেল, লোকে প্রেমামৃতে মগ্ন হইল। অতবড় দুষ্ট জগাই মাধাই সেও উদ্ধার হইয়া গেল। হাজার হাজার লোক আসিয়া শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। একে একে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

শ্রীজীব গোস্বামী

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি মহিমায় নিতান্ত কম ছিলেন না। ক্রমসন্দর্ভ ও ষট্সন্দর্ভ নামক ভক্তি-গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। ষট্সন্দর্ভের এমনই মধুর ভাব ও ভাষা, এমন গম্ভীর রস যে একবার যে এই ষট্সন্দর্ভ শ্রবণ করে তাহার আর অন্য কোন বিষয়ে মন ধাবিত হয় না। এমনই সুন্দর গ্রন্থ যে, এই গ্রন্থ না পড়িলে

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জানা যায় না। চারিদিকে গোঁসাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি।

ব্রজধামে শ্রীরূপ সনাতনের মত আর পণ্ডিত নাই জানিয়া একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ-সনাতনের সহিত তর্ক করিতে ব্রজধামে আসিলেন। রূপ-সনাতন নির্ম্মৎসর, নিরহঙ্কারী ছিলেন, তাঁহারা সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে কোনরূপ তর্ক-বিতর্ক না করিয়াই তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। রূপ-সনাতনের কাছে জয়পত্র পাইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীজীব গোঁসাঞির নিকট গেলেন। তখন শ্রীজীব যমুনায় স্নান করিতেছেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তথায় যাইয়া শ্রীজীবকে বলিলেন, দেখ রূপ-সনাতন আমার সহিত বিচার বিতর্ক না করিয়াই আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়েছেন, তুমিও আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও।

শ্রীজাব মনে মনে ভাবিলেন, এই মূঢ়, দাম্ভিক, পণ্ডিত রূপ-সনাতন যে কত বড় পণ্ডিত তাহা না জানিয়া এবং রূপ-সনাতন যে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া ইহাকে নৈতিকভাবে পরাজয় করিয়াছে ইহা না বুঝিতে পারিয়া মনে মনে বড় অহঙ্কারী হইয়া পড়িয়াছে। আজ আমি ইহার গর্ব্ব-খর্ব্ব করিয়া ছাড়িব। এই ভাবিয়া শ্রীজীব বলিলেন, রূপ-সনাতনের আমি একজন অকিঞ্চিৎকর শিষ্যানুশিষ্য; তাঁহারা অত্যধিক বিনয়বশতঃ তোমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন, আচ্ছা একবার আমাকে পরাজিত কর দেখি! তবেই বুঝিব তোমার পাণ্ডিত্য! এত বলিয়া শ্রীজীব পণ্ডিতের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, পণ্ডিতের পরাভব হইল।

রূপ-সনাতনের কর্ণে যখন পণ্ডিতের পরাভব কাহিনী পৌঁছিল তখন তিনি শ্রীজীবকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, তুমি বৈরাগী, তোমার আবার হারজিত কি? তুমি নিজে কেন পরাজিত হইয়া পণ্ডিতের

মান বাড়াইলে না? কেন তুমি নিজে দীনতা স্বীকার করিয়া পণ্ডিতের মান বৃদ্ধি করিলে না?

শ্রীজীব বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার গুরুর নিন্দাবাদ করে তাহার উচিত শাস্তি আমি তাহাকে দিব না? শ্রীজীব যে নিরভিমানী, রূপ-সনাতন তাহা ভালরূপেই জানিতেন, তবুও কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া শ্রীজীবকে শাসন করিতে লাগিলেন। না করিলে যে বৈষ্ণবের নিরভিমানিতা লোপ পায়! গুরুর বজ্রতুল্য বাক্য শুনিয়া শ্রীজীবের বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গুরুকে প্রসন্ন করিবার জন্য শ্রীজীব বহু স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই গুরুর বাহ্যকোপ দূর হইল না। শ্রীজীব একেবারে অন্ন জল ত্যাগ করিলেন, দিন দিন তাঁহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল; তবুও কেবল গুরুরূপ সনাতনের কথা চিন্তা করেন। তাঁহার দু'নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। শ্রীজীবের এইরূপ কষ্টের কথা শুনিয়া একদিন সনাতন শ্রীরূপের নিকট গিয়া বলিলেন, আচ্ছা সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ?

শ্রীরূপ কহিলেন, জীবে দয়ার চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। জীবে দয়াই শাস্ত্রমতে প্রধান ধর্ম্ম।

শ্রীরূপের মুখে এই কথা শুনিয়া সনাতন কঙ্কালসার শ্রীজীবকে লইয়া শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বহুদিন পরে গুরু সন্দর্শন করিয়া শ্রীজীবের প্রাণে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। শ্রীজীব হৃষ্টচিত্তে গুরুর চরণে প্রণিপাত করিলেন। শ্রীরূপ, শ্রীজীবকে ক্ষমা করিলেন। গুরু-শিষ্যে আবার পুনর্ম্মিলন হইল। এতদিন যে গুরু-শিষ্যে কোন ব্যবধান ছিল, তাহা আজিকার এই মিলন দেখিয়া কিছুই বুঝা গেল না। জলে যেরূপ শর্করা মিশিয়া যায়—শর্করার কোন চিহ্ন থাকে না, সেইরূপ গুরুর প্রেম-রসে শ্রীজীব

আবার ডুবিয়া গেলেন, গুরুর ক্রোধের একটু মাত্র চিহ্ন থাকিল না—থাকিল মাত্র—মিষ্টত্ব, মধুরত্বা।

শ্রীগৌরাঙ্গের পারিষদগণ।

এইবার শ্রীগৌরাঙ্গের অপর পারিষদ্‌দিগের ইতিহাস বলিতেছি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কে? শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি লীলা পরিগ্রহ করিয়া দুর্লভ প্রেমতত্ত্ব সর্ব্ব সাধারণকে বিলাইয়াছিলেন। তাঁহাতে পঞ্চতত্ত্ব দেদীপ্যমান। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অবতার, আর শ্রীমদ্‌ নিত্যানন্দ রাম অবতার। ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য স্বয়ং শিবের অবতার। শ্রীনিবাস, গদাধর, বিশ্বম্ভর, অদ্বৈত সকলেই মহাপ্রভুর পার্ষদ নিত্যসিদ্ধ, এঁদের মহিমা অপার। ইঁহারা ব্রজের সেই রাখালের অবতার। কেহ বলে নবদ্বীপ সাক্ষাৎ বৃন্দাবন, কেহ বলে নবদ্বীপ গোলক, কেহ বলে নবদ্বীপ শ্বেতদ্বীপ, কেহ বলে নবদ্বীপ অযোধ্যাধাম। শ্রীমান্‌ মহাপ্রভু যেমন সর্ব্ব অবতার, আর আমার নবদ্বীপও তেমনি সর্ব্বধামময়। লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গ আমার চারিযুগে চারি অবতাররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। সত্যযুগে তাঁহার দেহ শুক্লবর্ণ হইয়াছিল। ত্রেতাযুগে তাঁহার দেহ রক্তবর্ণ হইয়াছিল। দ্বাপরে শ্যামবর্ণে তিনি শ্যাম নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিযুগে গৌরবর্ণে গৌরাঙ্গ অবতাররূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলি আর দ্বাপরের যুগল

অবতার, কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ একত্র হইয়া নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীবকে নিস্তার করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরচন্দ্রোদয় নিজেই বলিয়াছিলেন, কেহ দাস্যভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ বা এই উভয়ভাবে অনুরক্ত, কাহারও বা রাধা-মাধবের প্রতিনিষ্ঠা, কাহারও বা দ্বারকানাথের প্রতি নিষ্ঠা, কাহারও বা (বৃন্দাবননাথ ও দ্বারকাধিপতি) উভয়ের প্রতি প্রীতি, কেহ বা আমার অন্যান্য অবতারে আসক্ত, আমি অখিলের সকলের মন একত্র করিয়া আমাতে আবদ্ধ করিব এবং বৃন্দাবনাসক্তির ভাবসকলকে প্রদান করিব।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে আপনি আপনার প্রেমরসে ডুবিবার জন্য গৌরাঙ্গ-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে।

একদিন নারদের এক গন্ধর্ব্ব শিষ্য গন্ধর্ব্বিণীসহ কৃষ্ণ রাধার যুগল-মূর্ত্তি ধরিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই অভেদ-স্বরূপ দেখিয়া এবং নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের অপরূপ রূপ দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন। আহা! শ্রীরাধা এরূপ রূপরসের আস্বাদন করে! আমিও রাধার মত প্রেমরস আস্বাদন করিব, সঙ্গে সঙ্গে কলির জীবকেও নিস্তার করিব। এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধা-ভাব-কান্তি লইয়া নবদ্বীপ ধামে আসিয়া উদিত হইলেন। ব্রজলীলায় যে যে রাখাল তাঁহার সহিত ব্রজ-লীলা করিয়াছিলেন, সেই সেই রাখাল নানা নামে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কল্প-বৃক্ষের সমান সর্ব্বরসের প্রযোজক ছিলেন। মাধবেন্দ্রের শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী মধুর রসাশ্রয় প্রেমানন্দ মতি ছিলেন। শ্রীমান্ মাধব শিষ্য ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দাস্য সখ্যরসের প্রযোজক ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই জনেই দাস্য ও সখ্যরসের অবতার ছিলেন। শ্রীমান্ রঙ্গপুরী বাৎসল্য রসের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন।

ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় ছিলেন। বৃন্দাবনে যে যে শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা স্বজন, সখা বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলে আসিয়া গৌরাঙ্গলীলায় একে একে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ এই সব পারিষদ্‌সহ প্রেমের বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় যে গোপ পর্জ্জন্য কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, সেই গোপ পঞ্চপুত্র সহ শ্রীহট্টে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিলেন। এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে গুণধাম জগন্নাথ নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই জগন্নাথের অন্য নাম পুরন্দর। ইঁহার পত্নী শচী ঠাকুরাণী। জগন্নাথ ব্রজলীলার নন্দ আর শচী ঠাকুরাণী নন্দরাণী। কেহ বলেন, ইঁহারা আদিতে, কশ্যপ অথবা কৌশল্যা ও দশরথ; কেহ বলেন বাসুদেব দেবকী রোহিণী, নতুবা বিশ্বরূপের জননী হইলেন কিরূপে? বিশ্বরূপ বলরামের অবতার। কিন্তু শচী ঠাকুরাণী সকলের মাতা আর পিতা জগন্নাথ মিশ্র সর্ব্ব অবতারের সার। বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। জম্বাবতী ও শ্রীমুকুন্দ নিত্যানন্দের মাতা-পিতা। রাঢ় দেশে ইঁহার বসতি ছিল, অন্য নাম ছিল—হাড়াই পণ্ডিত। লোকে বলে ইঁহারা সুমিত্রা দশরথের অবতার। শ্রীমান্ লক্ষ্মণের ভাব নিত্যানন্দে পূর্ণ প্রকট। পণ্ডিত গোবিন্দাচার্য্যের পূর্ব্ব লীলার জননী ছিলেন—অম্বিকা, এক্ষণে অম্বিকার নাম মালিনী, তিনি শ্রীবাসের গৃহিণী। ত্রেতাযুগে যিনি জনক রাজা ছিলেন, এ যুগে তিনি বল্লভাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইলেন। বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর কন্যা জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া। পূর্ব্ব-লীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা ছিলেন। এই লক্ষ্মী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী। ত্রেতাযুগে শ্রীরামের বিবাহে যে বিশ্বামিত্র ঘটক ছিলেন, তারপর কৃষ্ণ-লীলায় যিনি সদানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন, চৈতন্য-লীলায় তিনি বনমালী আচার্য্যরূপে প্রকট হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বজন্মে যিনি সত্রাজিত প্রেরিত ঘটক ছিলেন, তিনি এবারকার লীলায় কাশীনাথ ঘটক হইয়াছেন। পূর্ব্ব লীলায় যিনি সন্দিপনী মুনি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞসূত্র দিয়াছিলেন, চৈতন্য-লীলায় তিনি কেশব ভারতী হইয়া গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। রামলীলায় যিনি গুরু বশিষ্ঠ ছিলেন, এবারকার লীলায় তিনি গঙ্গাদাস হইয়াছেন। এই গঙ্গাদাসের কাছে প্রভু বাল্য-শিক্ষা লাভ করেন। ব্রজলীলায় যিনি বৃকভানু ছিলেন, চৈতন্য-লীলায় তিনি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুতে স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব দেদীপ্যমান। শ্রীগৌরাঙ্গের শিষ্য মাধবেন্দ্র পুরী. ব্রজলীলায় তিনি শ্রীমাধব মিশ্র। ব্রজলীলায় যিনি বলদেব তিনিই চৈতন্য-লীলায় বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গের অগ্রজ, তিনি কোন দিন দার-পরিগ্রহ করেন নাই। ব্রজলীলায় বসুধা জাহ্নবী, গৌরাঙ্গ লীলায় বারুণী ও রেবতী নামে শ্রীনিত্যানন্দের ঘর সুশোভিত করিয়াছেন। রেবতীর পিতা এ লীলায় প্রভুর পার্ষদ। জাহ্নবীর কন্যা বসুধা জগল্লক্ষ্মীময়ী, তাঁহার ভাগ্যের সীমা নাই, তিনি সৌভাগ্য বিজয়িনী। কেহ কেহ বলেন, বসুধা সরস্বতীরূপিণী। আজও গোপীনাথের পার্শ্বে জাহ্নবী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। দ্বাপরের যিনি রাজা শান্তনু, তিনি এই লীলায় শ্রীমান্ মাধবাচার্য্য, নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গা এই মাধবাচার্য্যকে পতিভাবে পূজা করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় যিনি প্রদ্যুম্ন নামে শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন, এই লীলায় তিনি শ্রীরঘুনন্দন নামে শ্রীচৈতন্যের পারিষদ্ হইয়াছেন। যিনি এ লীলায় ব্রহ্মচারী নকুল, তিনি ব্রজলীলায় প্রদ্যুম্ন মিশ্র ছিলেন। গোপেশ্বর বৃন্দাবনে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন, এ লীলায়ও তিনি প্রভুর পার্ষদ হইয়াছেন। কুবের নামক যক্ষ পূর্ব্ব লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপবালকগণের সহিত মিশিয়া নানা লীলা করিয়াছিলেন, এ লীলায় তিনি সেই কুবের

নামেই প্রভুর পার্ষদ হইয়াছেন। কুবেরের পুত্র শ্রীল অদ্বৈত গোসাঞি, তাঁহার গৃহিণী সীতা ও শ্রী, এই দুই ঠাকুরাণী যোগমায়া। সীতা ঠাকুরাণীর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ, রূপে যেন ঠিক কার্ত্তিক। কেহ কেহ বলেন গোপী ও অচ্যুত এই দুই রূপ লইয়া অচ্যুত আবির্ভূত হইয়াছেন। অচ্যুতের অনুজ কৃষ্ণ মিশ্র, সাধুজনেরা তাঁহাকেও কার্ত্তিকেয় বলিত। সীতার দুই সহচরী নাম নন্দিনী ও জঙ্গলী। ইঁহারা দুইজনে পূর্ব্ব লীলায় জয়া বিজয়া ছিলেন। দেবাদিদেব নারদ শ্রীবাস পণ্ডিতরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কপিবর হনূমান্ এবার শ্রীমুরারি গুপ্ত নামে পরিচিত। রাম লীলার অঙ্গদ এ লীলায় পুরন্দর, কপিরাজ সুগ্রীব এ লীলায় শ্রীগোবিন্দানন্দ, বিভীষণ মহারাজ এ লীলায় পুরী। চৈতন্য-লীলায় যিনি যবন হরিদাস রূপে বাহু তুলিয়া প্রভুর সহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে ঋচিক মুনির পুত্র ছিলেন। পিতৃ অভিশাপে কাশীতে যবনের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন পিতাকে পূজার জন্য তুলসী আনিয়া দিতেন, একদিন অধৌত তুলসী আনিয়া দেওয়ায় পিতা তাঁহাকে অভিশাপ করিলেন, সেই অভিশাপের ফলে হরিদাস যবনের কুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। ব্রজলীলায় সুমুখ নামে গোপ যশোদার পিতা ছিলেন, এ জন্মে সেই সুমুখ শচীমাতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। গর্গ মুনির দেহ ও সুমুখের দেহ এবার এক দেহে পরিণত হইয়াছে, তাই ত প্রভুর ভাবী জন্ম-কথা তাঁহারা বলিতে পারিয়াছিলেন। পুরাণ পাঠক পণ্ডিত দেবানন্দ শ্রীভাগুরি মুনিরূপে পূর্ব্ব লীলায় ব্রজে পৌরহিত্য করিতেন। কাশীনাথ, রামনাথ, শ্রীনাথ ও লোকনাথ পূর্ব্ব লীলায় সনকাদি মুনি চতুষ্টয়। পূর্ব্ব লীলায় বেদব্যাস বর্ত্তমান লীলায় বৃন্দাবন দাস, সখা কুসুমাপীড় আসিয়া তাঁহার দেহে মিলিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব লীলায় শুকদেব এবার বল্লভট্ট রূপে অবতীর্ণ। শ্রীমান্ গঙ্গাদাস ও শ্রীজগন্নাথাচার্য্য দুর্ব্বাসা ও বর্য্য ঋষিরূপে

আবির্ভূত হইয়াছেন। যিনি বিশ্বকর্ম্মা তিনি আজ বিশ্বেশ্বর আচার্য্যরূপে আবির্ভূত। সুদামা ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব লীলাতেও ভিক্ষুক ছিলেন এবারকার লীলায়ও বনমালী ভিক্ষুকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয় এবার গোবিন্দ গরুড়রূপে আসিয়া দেখা দিয়াছেন—প্রভুর তাঁহারা বড় প্রিয়পাত্র। পুরী আজ শ্রীপুরমানন্দ উদ্ধবের মূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশিত। পূর্ব্ব লীলার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এ লীলায় রাজা প্রতাপরুদ্র। দেব গুরুভদ্র কে তাহা জান কি? তিনি এ লীলায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। কুরুক্ষেত্রের সেই প্রিয়সখা—যে সখা—সখা বলিয়া কাঁধে উঠিতেন, কত আবদার করিতেন, আজ সেই প্রিয়সখা অর্জ্জুন পণ্ডিত অর্জ্জুন ও রায় রামানন্দের দেহে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভবানন্দের পাঁচ পুত্র আজ পঞ্চ পাণ্ডবের আত্মা লইয়া অবতীর্ণ। প্রভুর সেই বাল্য-সখা শ্রীদাম এ জন্মের অভিরাম, সুদাম সুন্দর ঠাকুর, বসুদাম ধনঞ্জয়, সুবল গৌরীদাসরূপে অবতীর্ণ। পূর্ব্বে প্রভুর ব্রজধাম লীলাস্থান ছিল এবার পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সেই ব্রজধামে পরিণত হইয়াছে। পরমেশ্বর দাস এবার প্রভুর সেই অর্জ্জুন সখা আর কালা কৃষ্ণদাস পূর্ব্ব লীলার লবঙ্গ সখা। খোলা বেচা ব্রাহ্মণ শ্রীধর পণ্ডিতের সহিত প্রভু খোলা কাড়াকাড়ি করিয়াছিলেন, ব্রজে যিনি শ্রীমধুমঙ্গল ছিলেন তিনিই এবারকার শ্রীধর পণ্ডিত। ব্রজের বলদেব সখা এবারকার হলায়ুধ। ব্রজের গায়ক মধুব্রত মধুকণ্ঠ মুকুন্দ বাসুদেব নামে দেশ বিদেশে বিদিত। ব্রজে যে সুধাকর বাদ্যকর ছিলেন আজ সেই সুধাকর উৎকলাস্থে বিজ্ঞ হইয়া জন্মিয়াছেন। ব্রজের নর্ত্তকী চন্দ্রহাস আজ জগদীশ নর্ত্তন বিনোদ-রূপে অবতীর্ণ। বৃন্দাবনের শারী-শুক এলীলায় শিবানন্দের দুই পুত্র।

রাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। শ্রীরাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী এবার অনুরাধা নাম ধারণ করিয়া গদাধরের দেহে

স্বপ্রকাশিত হইয়াছেন। মহাপ্রভু রাধাবেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; ললিতা এবার গদাধররূপে বিরাজিত। কৃষ্ণ প্রিয়াদের মধ্যে প্রধানা চন্দ্রাবলী কবিরাজ সদাশিবরূপে প্রকাশমান। পূর্ব্ব লীলায় ভদ্রা সখী এবার শঙ্কর পণ্ডিতরূপে উপস্থিত। ললিতাদেবী আজ স্বয়ং স্বরূপ গোস্বামী। বেশ রচনায় পটু সেই চিত্রাসখী এবার বনমালী কবিরাজরূপে অবতীর্ণ—তিনি প্রভুর সুখে সর্ব্বদা সুখী। রাধা সুখে সুখী চম্পকলতিকা এবার রাঘব পণ্ডিত হইয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গ বিদ্যা রসপতি এবার পতি প্রবোধানন্দ সরস্বতী হইয়াছেন। সখী ইন্দুলেখা কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে স্বপ্রকাশ। রঙ্গদেবী আজ ভট্ট গদাধর। ব্রজলীলায় যিনি শশিরেখা ছিলেন, তিনি এবারকার লীলায় কাশীশ্বর গোস্বামী হইয়াছেন। ব্রজের সখী কলাবতী এবার নারায়ণ বাচস্পতি নামে বিরাজমান। শ্রীকান্ত সেনে আজ কাত্যায়নী গোপী দেদীপ্যমান। বৃন্দাবনের বনদেবী বৃন্দা এবার তিনি মুকুন্দদাস নামে খণ্ডবাসী হইয়াছেন। ব্রজের সেই মধুমতি এবার নরহরি সরকার ঠাকুর নামে পরিচিত। ব্রজের রূপমঞ্জুরী এবার রূপ গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীরূপ সর্ব্বগুণধাম, সর্ব্বলোক আরাধ্য। তাঁহার সহোদর সনাতন; শ্রীচৈতন্যও তাঁহাতে অভিন্ন কলেবর। ব্রজের রসমঞ্জুরী এবার রঘুনাথ দাস নামে আবির্ভূত হইয়া আবার সেই ব্রজে গিয়াই বাস করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও কত শত গৌরাঙ্গ পার্ষদ যে—নানারূপে ব্রজের লীলা পরিপূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে একরূপ অসম্ভব।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।

রামচন্দ্র কবিরাজের বাটী বুধুরি গ্রামে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ—পণ্ডিত সমাজে প্রশংসনীয়। শ্রীআচার্য্য প্রভু নিজের গৃহের সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া দুই চারিজন ভক্তের সহিত কৃষ্ণকথা বলিতেছেন। রামচন্দ্র বড় ঘটা করিয়া প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। নিকটে দেখেন, বড় সুন্দর বৃক্ষ—শান্ত, স্নিগ্ধ, তপোবন সদৃশ দেখিয়া শিবিকা হইতে বিশ্রাম করিবার জন্য রামচন্দ্র অবতরণ করিলেন। সঙ্গে বহু বাদ্যকর ছিল, শিবিকার বাহক, লোক-লস্কর ছিল, তাহারাও বিশ্রাম করিবার জন্য বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। রামচন্দ্র কবিরাজের সুন্দর দেহ, তেমনি সোণার কান্তি! আচার্য্য প্রভু রামচন্দ্রের সুন্দর, সুঠাম তনু দেখিয়া নিজের শিষ্যগণকে বলিলেন, দেখ এ ব্যক্তি যদি কৃষ্ণদাস হয় তবে ইহাকে মানায়। কিন্তু দেখ এমন সুন্দর গৌর পুরুষ স্ত্রী সঙ্গ করিয়াই সময় কাটাইয়া দেয়। যে স্ত্রীলোক নরকের দ্বার, সেই স্ত্রীর মোহ মদিরায় মুগ্ধ হইয়া এ ব্যক্তি সংসার চক্রে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ইহারা বংশবৃদ্ধি করিয়াই মনে করে জীবনের সব কর্ম্মই ইহাদের হইয়া গেল। টাকা—টাকা—বিষয় বিষয় করিয়া ইহারা কেবল দিন রাত নানারূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই ব্যক্তি দেখ এমন সুন্দর কৃষ্ণ নাম ভুলিয়া বিবাহ করিয়া সংসার নাগপাশে আবদ্ধ হইবার জন্য যাইতেছে। ঐ যে বিবাহের সময় অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী পরাইয়া দেয় তাহা অঙ্গুরী নহে, তাহা মায়ার ফাঁস। শুভদৃষ্টি বলিয়া যে দৃষ্টি আছে, তাহা শুভদৃষ্টি নহে উঁহা পিশাচীর দৃষ্টি।

শিবিকায় বসিয়া রামচন্দ্র এ সব কথা সকলই শুনিলেন। নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিজের উপরই ধিক্কার আসিল। তাঁহার বিবেকের উদয় হইল। বাড়ীতে ফিরিলেন বটে, কিন্তু মনের সমস্ত প্রকার উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট হইল। এক দিন দুই দিন করিয়া তিন দিন হইল, রামচন্দ্র প্রভুর নিকটে গেলেন। রামচন্দ্র প্রভুর পাদপদ্মে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, প্রভু আমাকে কৃপা কর। বিষয় কুসঙ্গে আমার জীবন কলুষিত হইয়াছে, আমি অধম, দুঃশীল, পাপাচার, আমার প্রতি দয়া কর।

রামচন্দ্রের কাকুতি-মিনতি শুনিয়া আচার্য্য প্রভুর মনে দয়ার উদ্রেক হইল, বলিলেন, তোমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাকে দয়া করিবেন। প্রভু অতঃপর রামচন্দ্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে আরম্ভ করিলেন, আলাপে বুঝিলেন, রামচন্দ্র নিতান্ত অর্ব্বাচীন নহেন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান রামচন্দ্রের যথেষ্ট আছে। প্রভু তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমাকে আমি ভক্তি-শাস্ত্র পড়াইব, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে তোমাকে দীক্ষিত করিব। এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। রামচন্দ্রের ভক্তি দর্শন করিয়া প্রভু এত তুষ্ট হইলেন যে, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও রামচন্দ্রকে ছাড়িতেন না—রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ-শোক ভুলিতে পারিতেন না। একদিন প্রভু ও রামচন্দ্র উভয়ে আঙ্গিনায় পায়চারি করিতে করিতে কৃষ্ণ-কথা বলিতে-ছেন, প্রভু বলিলেন দেখ ত রামচন্দ্র অদূরে ঐ খড়ের গাদায় বোধ হয় সাপ দেখা যাইতেছে! রামচন্দ্র জানেন উহা খড়ের ব'ড়ে ভিন্ন অন্য কিছু নহে; কিন্তু তাহা হইলেও প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত রামচন্দ্র বলিলেন, হাঁ প্রভু একটা বড় সর্প। কিছুক্ষণ পরে প্রভু কহিলেন, না হে রামচন্দ্র উহা সর্প নহে, খড়ের বড়ে। রামচন্দ্র অমনি বলিলেন, হাঁ হাঁ প্রভু তাই, একটা বড়ে বটে।

একদিন প্রভু জপে বসিয়াছেন, দেখেন শ্রীকৃষ্ণ যেন জলকেলী করিতেছেন। দেখেন শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল যেন জলে পড়িয়া গেল। শ্রীমতীর সখীগণ সকলে একে একে—সেই কুণ্ডল খুঁজিলেন, কিন্তু কোনই সন্ধান পাইলেন না। তখন প্রভু যোগাসনে বসিয়া কর্ণের সেই কুণ্ডল খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিন দুই দিন করিয়া সাত দিন গেল, প্রভুর চৈতন্য আর হয় না। প্রভুকে বাহ্য-জ্ঞান-হীন দেখিয়া শ্রীমতী গৌরাঙ্গ প্রিয়া ঠাকুরাণী আদি সকলে কাঁদিয়া আকুল—শিষ্য ভক্ত সকলে কাঁদিয়া আকুল! সাত দিন সাত রাত্রি গেল—প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ আর হয় না, সকলেই বলিতে লাগিল প্রভু বোধ হয় এবার লীলা সংবরণ করিলেন। তখন সকলে বলিল, রামচন্দ্রকে ডাক, রামচন্দ্র প্রভুর অন্তর-কথা বেশ জানে। রামচন্দ্র কবিরাজের ন্যায় প্রভুর প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই, অতএব রামচন্দ্রকে শীঘ্র ডাকিয়া আন, বিলম্ব করিও না। এমন সময় রামচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রকে দেখিয়া সকলেই আশ্বান্বিত ও হর্ষান্বিত হইলেন। রামচন্দ্র প্রভুর পদে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাশে বস্ত্রাবৃত হইয়া বসিলেন। বসিয়াই তিনি ধ্যানস্থ ও সমাধিস্থ হইলেন। ধ্যানস্থ হইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে প্রভু যমুনার জলে নামিয়া শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজিতেছেন। রামচন্দ্রও সমাধিতে বসিয়া সখী হইয়া পড়িলেন। তখন প্রভু ও রামচন্দ্র—এই দুই সখীতে মিলিয়া শ্রীমতীর কুণ্ডল খুঁজিতে লাগিলেন। উভয়ে সিদ্ধ দেহে সেই কুণ্ডল খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্রতলে সেই কুণ্ডল পাইলেন।

তখন দুই সখী—প্রভু ও রামচন্দ্র আনন্দে কোলাকুলী করিতে লাগিলেন।

দুই সখী শ্রীমতীর কর্ণে সেই কুণ্ডল পরাইয়া দিলেন, শ্রীমতী প্রসন্ন হইয়া দু'জনকে তাম্বুল প্রদান করিলেন। দুই সখী তখন সেই তাম্বুল

চর্ব্বণ করিতে করিতে বাহ্য দেহে ফিরিয়া আসিলেন। চারিদিকে ভক্তগণ তাহা দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইল, তাম্বুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। সকলে প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইল, প্রভু সকলকে সেই তাম্বুল বাঁটিয়া প্রদান করিলেন। যে অমৃত পাইবার জন্য ব্রহ্মা আদি দেবগণ কত ব্রত উপাসনা করেন, আজ সেই অমৃত পাইয়া ভক্তগণ সকলে পরম পরিতৃপ্ত—কৃতার্থ ও চরিতার্থ হইল।

রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গাস্নানে যাইয়া স্নান পূজাদি করিয়া ফিরিয়া আসেন। সেই গঙ্গাঘাটে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বসিয়াও শিবপূজা করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রামচন্দ্রকে কেবল বলেন, তোমরা পূজা করিয়া শিবপূজা কর না কেন? কবিরাজ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিনা আর কাহাকেও পূজা করা বিহিত নহে। অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয়—গীতা ভাগবতে ঐ কথা লিখিত আছে। তথাচ ব্রাহ্মণেরা এ কথার মর্ম্ম না বুঝিয়া বলিলেন, তোমার যে কৃষ্ণ তিনি নিজে শিব আরাধনা করেন। রামচন্দ্র বলিলেন, আমি মূর্খ, শাস্ত্র জানি না, তবে একমাত্র উপাস্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়াছি। এই বলিয়া রামচন্দ্র চারিটী শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোক চারিটীর মর্ম্মার্থ এই—শিবই বৈষ্ণব হৌন আর বিষ্ণুই শৈব হৌন, কিংবা বিধি, বিষ্ণু, শিব তিনটী মূর্ত্তিই এক হউন, আমরা শিব এবং ব্রহ্মাকে নত মস্তকে নমস্কার করিয়া এবং উঁহাদের ভক্তগণের মধ্যে ক্রম দেখিয়া বিষ্ণুরই দাসত্ব আশ্রয় করিলাম। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, রামানুজ, বলি, ব্যাস এবং অম্বরিষ প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণুভক্ত, সুতরাং অপরাপর সকল দেবতারই প্রীতি পাত্র এবং জগতের মঙ্গল-প্রদরূপে অর্চ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ, এবং অন্ধকাদি ব্রহ্মা ও শিবের ভক্ত হইলেও তাঁহাদের প্রিয় ছিলেন না;

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও প্রীতি-পাত্র নহেন। তজ্জন্য তাঁহারা নিখিল জগতের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র কবিরাজের এ কথার প্রতিধ্বনি আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই :—

আত্মা রামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরু ক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

অর্থাৎ নিরহঙ্কার, বিধি নিষেধাতীত, আত্মারাম মুনিবৃন্দ শ্রীহরির এই প্রকার গুণ দেখিয়া তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

শ্রীশ্রীধর স্বামী।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ভারত বিশ্রুত। ভগবানের নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখিবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তিকে পৃথক পৃথক করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন। মূঢ়জন যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি পৃথক পদার্থ ইহা না বুঝিয়া এগুলিকে এক মনে করিয়া ভুল করে শ্রীধর স্বামী তাহাই দেখাইয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামী এগুলিকে পৃথক্ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন॥

"ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বিভু বিজয় ভূষণ।
ভক্তিমুখ নিরীখয়ে কর্ম্ম যোগজ্ঞান॥

কর্ম্ম জ্ঞান আদি মিশ্র ভক্তি যদি হয়।
ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রশংসয় ॥

অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানের প্রয়াস বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সাধু মুখ বিনির্গত শ্রুতি অনুগত ভবদীয় প্রসঙ্গকেই কায়মনোবাক্যে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে জীবন ধারণ করেন, ত্রিভুবনের অজিত হইলেও, আপনি তাঁহাদিগের নিকট পরাজিত। শ্রীধর বলিতেন—

শুদ্ধভক্তি একমাত্র অনন্য শরণ।
অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃ সিদ্ধ হন ॥
অনন্য করিয়া ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
দুরাচার হইলেও সে সাধু মধ্যে হয় ॥

এই কথার প্রতিধ্বনি আমরা শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় দেখিতে পাই—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।"

যে ব্যক্তি অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করে, অতি দুরাচার হইলেও সে সাধু মধ্যে গণ্য।

ভগবৎ গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির লক্ষণ। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান প্রভৃতি শ্রেয়ো দ্বারা লাভ করা যায়, ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিবলেই সে সমুদয় লাভ করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের কোনও বাসনা থাকে না, তথাপি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের পক্ষে সমস্তই সুলভ। কর্ম্মযোগের ফল ভগবৎ কৃপা, ভগবৎ কৃপার ফল ভক্তি, সুতরাং ভক্তিই ফলস্বরূপ। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ মানুষকে কেবল অহঙ্কারী করিয়া তুলে। ভগবান কাঙ্গালের ধন, দরিদ্রের রতন, তিনি অহঙ্কারীর কেহ নন। তিনি দীনহীনকে বড় ভালবাসেন। ভক্তিই দীনতা আনয়ন করে।

সুতরাং ভক্তিই শ্রেষ্ঠ রাগাত্মিকা কেবলা ভক্তি হইতে প্রেম জন্মে, ভালবাসার আধিক্য জন্মিলে তখন প্রেম ও প্রেমাস্পদ এক হইয়া যায়। উহাদের আর পৃথক বলিয়া মনে হয় না। যে ব্যক্তি ভগবৎ প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি অলোক সাধারণ সর্ব্বজন পূজ্য। ভগবৎ কৃপা ব্যতীত জীবের ভক্তি লাভ হওয়া সুদুর্লভ। ভগবান কাহারও প্রতি বিমুখ নহেন। সর্ব্বলোক পূজ্যা গোপীগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। গোপীদের প্রেম—কাম—বিলাস নহে। প্রেমাস্পদের সহিত এক হইয়া যাওয়া, এরূপ প্রেম—কল্পনাও করা যায় না। সংসার চিন্তা মানুষকে রজঃ বা তমোগুণে আবৃত করিয়া ফেলে। কিন্তু ভক্তির উদয় সত্ত্ব ব্যতীত হয় না। ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে মনে সত্ত্বগুণের উদয় হয়।

"শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যা ভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি অবহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্য চিরেণ তারকং ভব প্রবাহোপরম্ পদাম্বুজং॥"

হে কৃষ্ণ! হে মাধব! যাঁহারা তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন, তোমার নাম গান, তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তোমার চরিত্র সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহারাই তোমার সংসার ভয় নিবারক চরণাম্বুজের দর্শন প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, ভগবান তাঁহাদের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকেন। আদি পুরাণে ভগবান বলিয়াছেন—

"গীত্বাচ মমনামানি, বিচরেন্মম্ সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহং তস্য চার্জ্জুন॥"

ভক্তিলাভের উপায় মহাজন ও ভগবানের কৃপা। গঙ্গা পাপ হরণ করেন,

শশী তাপ হরণ করেন, কল্পতরু দারিদ্র্য হরণ করেন, কিন্তু সাধু সমাগমে পাপ, তাপ, দৈন্য—এই তিনই দূর হইয়া যায়। মহৎসঙ্গ দুর্লভ ও অগম্য, কিন্তু অমোঘ। দুর্লভ কেন না অনেক সুকৃতি না থাকিলে সাধু চেনা যায় না। হয়ত নিকটে একজন মহাপুরুষ বাস করিতেছেন, কত দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, আর আমি নিকটে থাকিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। কুক্ষণে এক বন্ধুর মুখে তাহার নিন্দা শুনিয়াছিলাম, সেই নিন্দার ভাবই আমার বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এইরূপে কত লোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এই জন্য সাধু সঙ্গ দুর্লভ। ঈশ্বরের কৃপা হইলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ভগবান্ দয়া করিয়া যদি তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করেন, তবেই আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি।

"তব দয়া বিনে, এ পাপ জীবনে,
সাধু ভক্ত জনে কেমনে চিনিব ?"

ভগবানে ও ভগবানের ভক্তে কোন প্রভেদ নাই। ভগবান্, ভক্ত ও ভাগবত এই তিনই এক—একেই তিন। সুতরাং ভক্ত-কৃপা হইলেই তাঁহার কৃপা হইল মনে করিতে হইবে। মহাজন-সঙ্গ যেমন ভক্তি লাভের উপায়, কুসঙ্গ তদ্রূপ সর্ব্বনাশের কারণ। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন সর্প, ব্যাঘ্র, কুম্ভীরাদিকে বরং আলিঙ্গন করিও, তথাপি ভগবৎ সঙ্গ বিমুখ পাষণ্ডের সঙ্গ করিও না। অসৎ সঙ্গ, কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ। উহারা তরঙ্গকারে আসিয়া পরে সমুদ্রের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে। মানুষের মন স্বভাবতঃই কাম ক্রোধের অধীন, তারপর যদি আবার সে কুসঙ্গে বাস করে, তাঁহা হইলে ক্ষুদ্রাকার কামাদি বৃহদাকার ধারণ করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? মায়ার

হাত হইতে কে রক্ষা পায়? যে সঙ্গ ত্যাগ করে সেই রক্ষা পায়। সাধু-সঙ্গই ভবার্ণবে উত্তীর্ণ হইবার পোত-স্বরূপ। মায়ামুক্ত ব্যক্তি বিধি-নিষেধের বহির্ভূত হইয়া যান। তিনি স্বয়ং ভবসরিৎ উত্তীর্ণ হন এবং লোক-দিগকেও উদ্ধার করেন। প্রেমিক ভক্ত স্বয়ং হৃদয়ে রসাস্বাদ করিলেও প্রেমের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারেন না। কারণ উহার ভাষা ব্যক্ত করা যায় না, উহা অনুভবেরই যোগ্য; বোবার রসাস্বাদন তুল্য। তথাপি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহা গুণহীন, কামনাহীন, প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিচ্ছেদহীন, অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর মাত্র। গুণহীন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কাহারও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে প্রেম করা যায়, তবে তাহা প্রেম নহে। ধন মান পুত্রাদির আশায় ভগবানে প্রেম অর্পিত হইলে তাহা প্রেম নহে। গুণ দেখিয়া যে ভালবাসা জন্মে, গুণের অভাবে তাহা লোপ পায়, প্রেম তাদৃশ নহে। কামনা জনিত ভালবাসা কামনার পূরণ হইলে লাঘব হয়। ঐ সকল প্রেমে বিচ্ছেদ সম্ভব, কিন্তু ভক্তের যে প্রেম তাহাতে বিচ্ছেদ নাই। প্রেমের পাত্র হইতে আদান প্রদান রূপ কোন ব্যাপার থাকে না; আমি কেবল ভালবাসিয়াই পরিতৃপ্ত, ইহাই প্রেমের রীতি। প্রেমে কোন ব্যবসাদারী নাই, কোন যাতনাও নাই। ভক্তির প্রগাঢ়তা-বস্থায় প্রেমের উদয় হয়। শাস্ত্রে আছে বটে, "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ হরিভক্তি সুদুর্লভা।" বস্তুতঃ ভক্তি সুদুর্লভা হইলেও তৎসাধন কষ্ট সাধ্য ব্যাপার, অর্থ ব্যয় প্রভৃতি কিছুই নাই, ভক্তি সহজলভ্য। ভক্তি শান্তি ও পরমানন্দরূপা। যিনি ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহার সকল চিন্তা দূর হইয়া যায়। কিছুতেই তাঁহার প্রাণে অশান্তি আনয়ন করিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ লোকের বা সমাজের অনিষ্ট চিন্তা করেন না। যাঁহারা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করেন, তাঁহারা অন্য বিষয়ে কেন চিন্তা করিবেন?

ভগবান্ ভিন্ন অন্য বিষয় তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। সুতরাং লোক ব্যবহার বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন। তাঁহারা ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত। তাঁহারা স্ত্রী, ধন লোক চরিত্র শ্রবণ করেন না। ভক্তেরা অভিমান, দম্ভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সদসৎ প্রবৃত্তি ভগবানে আহুতি প্রদান করেন না। সুতরাং তাঁহারা সুখ দুঃখাতীত, নির্ব্বৈর, শান্ত। তাঁহাদের দ্বারা জগতের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় না। যাবতীয় মানসিক বৃত্তি ভগবদুন্মুখী করিতে পারিলে আর কোনই অশান্তি আসিতে পারে না। ভগবদ্বিমুখতাই সকল অশান্তির মূল।

বৃথা তর্ক না করিয়া ভগবানের মহনীয় মহিমা চিন্তা করাই উচিত। অনন্ত জলনিধি, স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, জীবজন্তু, সৌরজগৎ, পৃথিবীর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে ভগবানে মহিমা প্রতিভাত হয়। স্বল্প বুদ্ধি নাস্তিকেরাই তাঁহাকে চিনিতে বা জানিতে পারে না। কিন্তু জীবপূর্ণ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই ভগবানের মহিমা পরিস্ফুট হয়।

জ্ঞান হইতে মুক্তি সুলভ, কিন্তু হরিভক্তি অতি দুর্লভ। তবে নাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি সুলভ হইতে পারে। নাম হ'তেই নামীর রূপ, গুণ, ক্রিয়া মনে পড়ে। রূপ, গুণ, ক্রিয়া এই তিনেই বস্তুর সত্ত্বা প্রতীত হয়। এক ব্রহ্ম-পদার্থ রূপ, গুণ, ক্রিয়া শূন্য। ভক্তের ঈশ্বর অনন্ত গুণনিধি। নাম আরও হইলে নামীকে বশীভূত করিতে আর বিলম্ব হয় না। নাম সর্ব্ব অনর্থ নাশ করে, চিত্ত বিশুদ্ধ করে, মায়াপাশ ছেদন করে, অনুরাগ উৎপাদন করে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" এই হইতে বুঝা যায় যেখানে ভগবানের নাম গান হয়, সেইখানেই ভগবান্ আছেন। সুতরাং নাম হইতে তিনি পৃথক্‌ভাবে থাকেন না। মায়াবদ্ধ মানব সহজে



কবীর। (৫৪ পৃষ্ঠা)

ইহা বুঝিতে পারে না, কখনও যদি ভাগ্য গুণে সাধুসঙ্গ ঘটে, তখন সে বুঝে যে সে কৃষ্ণ-দাস।

নামে রুচি না জন্মিলে ভক্তি সুদুর্লভ। কৃষ্ণনাম অনাদি, চিন্ময়। যেই কৃষ্ণ সেই নাম একই তত্ত্ব। নাম নামী ভিন্ন নহে, নাম চৈতন্য বিগ্রহ নামীর সহিত বিভিন্ন। ভগবানের নাম, রূপ-লীলা অভিন্ন, তাহাতে জড়ের সম্পর্ক নাই। নাম, রূপ, গুণ, লীলা এই চারিটির মধ্যে নামই আদি, ইহাই সকলের প্রতীতি। নামেতেই রূপ, গুণ, লীলা ফুটিয়া উঠে; কৃষ্ণের সমগ্র লীলা নামেই বিদ্যমান; বদ্ধজীব শ্রদ্ধা সহকারে যদি নাম লয় তবে তাহাকে বৈষ্ণব বলা যায়। যাহার নামাভাব হয় সে বৈষ্ণব প্রায়, সে নাম কৃপাবলে শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। এ সংসারে নামের সমান বস্তু নাই, কৃষ্ণের ভাণ্ডারে নামই পরম ধন। ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হউক, যাহার মুখ হইতে কৃষ্ণনাম বাহির হয়, সে পবিত্র হইয়া উদ্ধার হইয়া যায়। দান, যজ্ঞ, জপ, স্নান প্রভৃতিতে কালাকাল বিচার করিতে হয়—কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধামাত্রেই অধিকার জন্মে। হরিনামই এই ভীম কলিযুগের ধর্ম্ম, যে অনন্য শ্রদ্ধায় নামাশ্রয় করে, তাহার সর্ব্ব স্বার্থ সিদ্ধি হয়। নামে একান্ত রতি জন্মিলে অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না, অন্য দেবতার পূজা করিবার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীশ্রীধর স্বামী এই কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ প্রচার করিয়াছিলেন, যত বিরুদ্ধ মত তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন। কাশীধামে যত দণ্ডী মতাবলম্বী তাঁহারা কিন্তু কিছুতেই শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তখন শ্রীধর দণ্ডীদের নিকট গিয়া বলিলেন, শ্রীবেণীমাধবের চরণে টীকা লইয়া যাওয়া যাউক, শ্রীবেণীমাধব যদি আমার এই টীকা গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমার এই টীকা মানিবে ত? দণ্ডীরা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন

স্বামিজী দণ্ডীদের সমভিব্যাহারে বেণীমাধবের নিকট যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে টীকা স্থাপন করিবামাত্র তিনি তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিলেন। তখন দণ্ডীরা পরাভব স্বীকার করিলেন। শ্রীধরের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি উঠিল।

শ্রীধর শুধু ভাগবতের টীকাকার ছিলেন না, তাঁহার বৈরাগ্যের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিতে করিতে সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিল, তিনি পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীকে ফেলিয়া বনে চলিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এরূপ সময়ে তাঁহার স্ত্রী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু স্ত্রী নিজে মারা গেলেন। শ্রীধরের প্রাণ বনে যাইবার জন্য আকুল, কিন্তু এই সদ্যপ্রসূত শিশুটীকে কে রক্ষা করিবে? শ্রীধর এক মনে এই কথা ভাবিতেছেন। এমন সময় ঘরের চাল হইতে হঠাৎ একটি জেঠির ডিম পড়িল। ডিমটি পড়িয়াই তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, তন্মধ্য হইতে একটি বাচ্ছা বাহির হইল। এক মক্ষিকা সেই বাচ্ছাটিকে রক্ষা করিল। তখন শ্রীধরও ভাবিলেন, যে এই জেঠির বাচ্ছাটিকে রক্ষা করিল—সে এই শিশুটীকেও রক্ষা করিবে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীধর সংসার ত্যাগ করিলেন। গ্রাম্য লোকেরা সেই শিশুটীকে লালন-পালন করিতে লাগিল। কালে সেই শিশু এক মহা পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল ভট্টি। ভট্টি রামলীলা সাহিত্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত